ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ চতুর্থ সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ ৪১৩

COR-413

India, Her Neighbours and the Contemporary World

সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ জুন ২০২৩ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.06.2023

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR 413: India, Her Neighbours and the Contemporary World

Block- 1: Partition of India (1947) and aftermath

Unit-1: Martial politics in Pakistan, bilateral relationship between India and Pakistan

Unit-2: Impact of cold war relations: between Russia and America in the sub-continent.

Block- 2: Kashmir issue

Unit-3: Origin and development: Role of the National Conference led by Sheikh Abdullah

Unit-4 : Foreign intervention and attempts of making it an international issue

Unit-5: The terror tactics -Kargil War and its consequences.

Block- 3: Birth of Bangladesh

Unit-6: India's role in liberating the country

Unit-7: Changes in the balance of India's relations with Russia and America

Unit-8: Political and commercial relations of India with Bangladesh.

Block- 4: India and the Third World

Unit-9: Policy towards South/ Southeast Asian countries

Unit-10: The NAM, SAARC and the ASEAN relations with Sri lanka

Unit-11: Relations with Myanmar and the Rohingya issue.

Block- 5: Changing relationship between India and Afghanistan

Unit-12: Era of Russian intervention

Unit-13: American reaction and emergence of the Talibans in the 1990's

Unit-14: The anti-American stance of the Talibans-Al Qaida link and the second phase of Talibanism (2022).

Block- 6: Phases of Indo-China relations

Unit-15: The Mao and post-Mao periods, Chinese expansionism and India's reaction the CPEC and OBOR projects

Unit-16: Indo-China border conflicts from the 1960/-recent conflicts in Doklam (2019) and Ladakh (2022).

ACKNOWLEDGEMENT

Content	page
BLOCK 1: Partition of India (1947) and aftermath	
BLOCK-2: Kashmir issue	
BLOCK 3: Birth of Bangladesh	
BLOCK 4: India and the Third World	
BLOCK 5: Changing relationship between India and Afghanistan	
BLOCK 6: Phases of Indo-China relations	

Block 1

Partition of India (1947) and aftermath

Unit 1

Martial Politics in Pakistan bilateral relationship between India and Pakistan

Unit 2

Impact of Cold War Relations: Between Russia and America in the Sub-Continent

উদ্দেশ্য

সূচনা

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক

ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব

ঠান্ডা লড়াই 1947-1979

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

- পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা
- পাকিস্তানে সামরিক শাসন এবং পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক
- ভারত পাকিস্তান সম্পর্কে ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব

সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর দুই মহাশক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এবং সমগ্র বিশ্ব দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এশিয়া ও আফ্রিকার অবদমিত দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জনের দিকে ধাবিত হয় এবং ঔপনিবেশিকতার দ্রুত অবসান ঘটতে থাকে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে যুদ্ধপরবর্তী এইসব পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন দুই বিবদমান গোষ্ঠীর সংঘাত থেকে ভারত দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্বশান্তি ও সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট হয়, অন্যদিকে উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আদর্শে অবিচল থাকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতের নিজস্ব কোন পররাষ্ট্রনীতি ছিল না। কেননা তখন ভারতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই ভারতের নীতি নির্ধারিত হত। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারত এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার ভিত্তিভূমিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এশীয় রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক অভিযানের কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের পর, ব্রিটেন রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি গ্রহণ করেন। এইভাবেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ভারত আত্মপ্রকাশ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত স্বাধীনতালাভ করার পূর্বেই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এং বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেন। ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্ত রেখে সমমনোভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করেন ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান জওহরলাল নেহরু (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রি.)। "We propose, as far as possible, to keep away from the power politics of groups, aligned against one another, which have led in the past two World Wars and which may again lead to disasters of even vaster scale."

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির চরিত্র নির্ধারণে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব দেখা যায়, যথা-ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব, অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান পররাষ্ট্রনীতির চরিত্র নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব স্থাপন করেছে। ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং মধ্য-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। স্বভাবতই মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের নিকটবর্তী দেশগুলির রাজনীতি ও তাদের কূটনৈতিক অবস্থান ভারতের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হল পাকিস্তান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বিশেষ উল্লেখের পরিচয় রাখে। দেশভাগজনিত সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়েও দুই দেশকেই একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংখ্যালঘু-সংক্রান্ত সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকে উভয় দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দলে দলে চলে যেতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানে অ-মুসলিম সম্প্রদায়-এর ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু হলে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। অনেকে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। সংখ্যালঘু সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুদেশের মধ্যে বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পরিস্থিতি এত জটিল আকার ধারণ করে যে জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ দিল্লিতে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন (৮ই এপ্রিল, ১৯৫০ খ্রি)। এই চুক্তি নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি অথবা 'দিল্লি চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে ঠিক হয় যে দুটি দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাবে এবং দুটি রাষ্ট্রই সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব প্রতিপালন করবে। পাকিস্তানের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ও ভারত বিরোধীতার ফলে অবশ্য চুক্তির শর্তাবলী ঠিকমত রূপায়িত হয়নি। তবে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। নেহেরুর মতে এই চুক্তির ফলে সংখ্যালঘুদের ভীতির মানসিকতা ('the psychology of fear') প্রশমিত হবে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তনে যেমন গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ মতাদর্শের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, অনুরূপভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ নির্ধারণে নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক যেমন আগাগোড়া পারস্পরিক মতবিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক অনুকুল থেকে প্রতিকূল খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক: ভারত-পাকিস্তান সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কের উৎস ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে। পকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন দ্বি-জাতিতত্ত্বের (Two-Nation Theory) কট্টর সমর্থক। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র চরিত্র সম্পর্কে জিন্না মন্তব্য করেছিলেন, "It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality.... The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literature." (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত জিন্নার ভাষণ।) ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জাতীয় কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা ও জিন্নার অনমনীয় মনোভাব এসবের ফলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রি.) পর থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতির মূল ভিত্তি হয়ে উঠল ভারত-বিরোধিতা।

ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে দুই ধরনের উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়-দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বি-মেরুকরণ। ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক আঞ্চলিক সমস্যা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তর সংঘাত দুই দেশের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে।

পাকিস্তানে সামরিক রাজনীতির (martial politics) ইতিহাস গভীরভাবে জড়িয়ে আছে এর জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রপটের সাথে। উদ্ভবকাল থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের উদ্ভব হলেও, তার মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল। Political Analyst আহমেদ বিলাল মেহমুদ এর মতে, বারংবার মিলিটারি শাসনের অভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামরিক অভ্যুত্থানকে নিম্নলিখিত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

১৯৫৮ - জেনারেল আয়ুব খান (3rd commander-in-chief of Pakistan)

১৯৬৯ - জেনারেল ইয়াহিয়া খান (5th Commander-in-Chief of Pakistan)

১৯৭৭ - জেনারেল জিয়াউল হক (2nd COAS of Pakistan)

১৯৯৯ - জেনারেল পারভেজ মুশাররাফ (7th COAS of Pakistan)

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন| পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলি খান। যেকোনো নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের ন্যায় পাকিস্তানকেও স্বাধীনোত্তর বছরগুলিতে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। লিয়াকত আলী খানের প্রধানমন্ত্রিত্বের দরুণ ১৯৫১ সালে প্রথমবার পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে। মেজর জেনারেল সৈয়দ শাহিদ হামিদ এবং মেজর জেনারেল আকবর খানের পাশাপাশি বিখ্যাত কবি ফাইজ আহমেদ ফাইজও জড়িত ছিলেন নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনায়। তবে তাদের পরিকল্পনা শেষমেশ ব্যর্থ হয় এবং মেজর জেনারেল আকবর খান ও ফাইজ আহমেদ ফাইজের কারাদন্ড হয়। উল্লেখ্য, এই সময় জেনারেল আইয়ুব খান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পক্ষেই ছিলেন।

1953 সালে, গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারকে বরখাস্ত করেন।যদিও প্রধানমন্ত্রী গণপরিষদের (Constituent Assembly) এর সমর্থন পাচ্ছিলেন, তদুপরি তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং কেবলামাত্র তা নয়, 1954 সালে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদকেও (Constituent Assembly) বরখাস্ত করেন গভর্নর-জেনারেল বলাবাহুল্য, সামরিক বাহিনী এবং আদালত গভর্নর-জেনারেলের পক্ষে ছিল। দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় সরকার অবশেষে সেনাবাহিনীর কাছে সাহায্য চেয়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় লাহোরের কর্পোরেশন কমান্ডার জেনারেল মুহাম্মদ আজম খান দেশের কিছু অংশে প্রথম সামরিক আইন (Martial Law) জারি করেন।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। কড়া হাতে দাঙ্গা দমন করা হলেও অসহিষ্ণুতার বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন সমাজে। স্বাধীনোত্তর বছরগুলিতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, আঞ্চলিক বিরোধ এবং অর্থনৈতিক সমস্যার ফলস্বরূপ দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং কেবলমাত্র তাই নয় এর পাশাপাশি রাজনীতিতে

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি, অভিজাতদের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে তার জনগণদের সুষ্ঠু শাসন এবং বিচারব্যবস্থা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। উদ্ভবের সময়পর্ব থেকেই পাকিস্তান দেশভাগজনিত সমস্যা, দাঙ্গা, জাতীয় ভাষাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, ইসলামের প্রভাব, প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্ব, কেন্দ্র-প্রদেশ ক্ষমতা বন্টন নিয়ে জর্জরিত থাকায় সংবিধান রচনা এবং সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত হয়। ১৯৫৬ সাল নাগাদ পাকিস্তানের সংবিধান ঘোষিত হয়। তবে এই গণতান্ত্রিক কাঠামো খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান স্বৈরাচারী শাসনের (Autocratic rule) মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। "উন্নয়নের দশক" হিসাবে পরিচিত আইয়ুব খানের শাসনামলে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং চালু করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করা হয়, এবং নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও সামরিক বাহিনী অনেকাংশে হস্তক্ষেপ করেছিল। আইয়ুব খান প্রধানত পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের একটি জোট গঠন করেন যার মধ্যে ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী শিল্পপতি এবং অভিজাত জমিদাররাও ছিলেন। এর দ্বারা সংসদীয় সরকারকেও প্রতিস্থাপন করা হয়। আইয়ুব খান পুরোনো রাজনীতিবিদদের বরখাস্ত করেন এবং তার পাশাপাশি ক্ষমতাবান এবং অর্থবান ব্যক্তিদের হাতে ভোটদানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয় এবং তার পাশাপাশি চলতে থাকে ভোট কেনা এবং ঘুষ দেওয়ার দুর্নীতি।

ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষের মধ্যে আইয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে সংক্ষিপ্তভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। নির্বাচনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) বিজয়ী হয়। যাইহোক, আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেঅস্বীকার করলে শেষমেশ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জনে তৎপর হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসাবে উদ্ভব হয় বাংলাদেশের।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রথম বেসামরিক রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতায় আসেন জুলফিকার আলি ভুট্টো, যিনি আবার অন্যদিকে ছিলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) প্রতিষ্ঠাতা। ভুট্টোর মেয়াদে একটি নতুন সংবিধানের খসড়া রচনা করা হয়, এবং তার পাশাপাশি শিল্পে জাতীয়করণও হয়। তবে তার সময়পর্বেও কর্তৃত্ববাদ, রাজনৈতিক দমন এবং নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য, এই সমস্যা গুলো তার শাসনপর্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং এই বেসামরিক শাসন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৭ সালে পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জুলফিকার আলি ভুট্টো ক্ষমতাচ্যুত হন।

১৯৭৭ সালে জেনারেল মুহাম্মদ জিয়া-উল-হকের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থানে ভুট্টোর সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। জিয়া-উল-হক সামরিক আইন জারি করেন এবং শরিয়া প্রবর্তন সহ ইসলামীকরণ নীতি শুরু করেন এবং এর পাশাপাশি বিরোধী মতামতকেও তিনি দমিয়ে রাখেন।তার শাসনামলে পাকিস্তান ঠান্ডা লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর পক্ষ নেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর কাছ থেকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা লাভ করে। ১৯৮৮ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল জিয়া-উল-হকের মৃত্যুর সাথে আকস্মিকভাবে সামরিক শাসনের অবসান হয়। নির্বাচনের দ্বারা জুলফিকার আলি ভুট্টোর কন্যা বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বাধীনে বেসামরিক শাসন ফিরে আসে। যাইহোক, তার সরকারও দুর্নীতি এবং অদক্ষতার অভিযোযে অভিযুক্ত হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে বেসামরিক সরকার এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই

দেখা যায়, যার ফলে বারবার হস্তক্ষেপ এবং সরকারগুলিকে বরখাস্ত করা হয়। বেনজির ভুট্টো এবং নওয়াজ শরীফ দুজনেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এই সময়পর্বে এবং উভয়েই সামরিক বাহিনীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। মোশাররফের শাসনামলে একটি আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সময় দেখা যায়, তবে এই পর্বও কর্তৃত্ববাদ, নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব, মানবাধিকার দমন এবং বিরোধী মতামত খর্ব করার মত সমস্যা দ্বারা জর্জরিত ছিল। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এর শাসনপর্বে ৯/১১ এর দুর্ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সাথে সম্পর্কের অবনতি হয়।

২০০৮ সালে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা এবং গণতন্ত্রের আহ্বানের মধ্যে জেনারেল মোশাররফের শাসনের অবসান ঘটে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি ক্ষমতায় আসে। তবে বেসামরিক শাসন এবং সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সরকার গঠিত হলেও বরাবর সামরিক বাহিনীর প্রতিপত্তি বজায় থেকেছে পাকিস্তানে।

বলাবাহুল্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পালাবদল এবং টালমাটাল অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের সাথে তার সম্পর্ক প্রভাবিত করে চলেছে বিগত সাত দশক ধরে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই গণতন্ত্রের পরিবর্তে পাকিস্তানে কেন্দ্রমুখী একনায়কতন্ত্র বা সামরিকতন্ত্রের দিকে ঝোঁক লক্ষ করা যায়। এই একনায়ক শাসকের সাফল্যের অন্যতম শর্ত ছিল ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশনীতি পরিচালনা করা। স্বভাবতই এক্ষেত্রে অন্যতম অবলম্বন ছিল কাশ্মীরের সীমান্ত সমস্যা। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আইয়ুব খান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন এবং অপ্রচলিত অস্ত্র পরীক্ষার জন্য ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের জায়গা তৈরি করবার জন্য পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করবার ব্যাপারে আমেরিকার প্রস্তাবে সায় দেন। এছাড়া চিনের সঙ্গেও তাঁর বোঝাপড়া দৃঢ় হয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের সক্রিয়তা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারত তিনটি কারণে আতঙ্কিত বোধ করেছিল। প্রথমত, শুধু পাক-সীমান্ত নয়, কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান ভারত-চিন সীমান্তের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং চিন-পাকিস্তান সমঝোতা ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কা ভারত সরকারের ছিল। দ্বিতীয়ত, চিন পাকিস্তানের পক্ষে চলে যাওয়ায় এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় ছিল। তৃতীয়ত, একই কারণে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কাও ছিল। এই কারণে গুরুত্ব ফিরে পাওয়ার আশায় এবং চিনকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে নেহরু চিনের সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নেন। কিন্তু ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয় একদিকে যেমন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। এর ফলে ১৯৬৫ সালে গুজরাটের কচ্ছের রান অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে অবশ্য পাকিস্তান সফল হয়নি, বরং নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছুটা অঞ্চল ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করে নেয়।

সত্তরের দশকে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের পুনরায় অবনতি ঘটে। এখন কাশ্মীর সমস্যা নয়, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপমহাদেশে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান-এর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ইয়াইয়া খাঁর নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য পৈশাচিক দমননীতি গ্রহণ করে। এরফলে সীমান্ত অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রথম দিকে। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালায়। এর ফলে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতের অনুকূল ছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা ও মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এইভাবে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু পাকিস্তান পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি, প্রতিশোধস্পৃহা তার ভারত-নীতিকে প্রকট করে তুলেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পুনরায় ভারত-পাকিস্তান সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে (ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.)। পূর্ব পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১), পূর্ব পাকিস্তানে পক-সেনাবাহিনীর লক্ষাধিক সৈন্য আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় সূচনা করে। রাষ্ট্রপতি ইয়াইয়া খাঁ ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং জুলফিকার আলি ভুট্টো রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।। পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে ভুট্টো ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের আগ্রহ দেখালেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মৈত্রী-বৈঠকে বসতে রাজী হলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে সিমলাচুক্তি সম্পাদিত হল (২৮শে জুন, ১৯৭২ খ্রি.)। সিমলা চুক্তিতে বলা হয়েছিল-(১) সমস্ত বকেয়া বিরোধের অবসান ঘটিয়ে দুটি দেশ বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলবে, (২) দুটি দেশ নিজস্ব সহায়সম্পদকে নিজ নিজ দেশের জনকল্যাণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত করবে এবং সামরিক ব্যয় হ্রাস করা হবে, (৩) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের ওপর দুটি দেশ পুনরায় আস্থা ব্যক্ত করবে, (৪) উভয়দেশের মধ্যে যোগাযোগ, ভ্রমণের সুবিধা ও বাণিজ্যিক লেনদেন প্রভৃতি স্বাভাবিক করে তুলবে। সর্বোপরি (৫) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর জম্মু-কাশ্মীরের ভূখণ্ড দুই পক্ষের যে অবস্থান ছিল, তা উভয়পক্ষ মেনে নেবে এবং পরবর্তীকালে শান্তিপূর্ণ পথে সব দ্বিপাক্ষিক সমস্যার মীমাংসা হবে। কিন্তু সিমলাচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও

মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আশা বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ হল কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের অনড় অনমনীয় মনোভাব। পাকিস্তান বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈঠকে যেমন গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ সম্মেলনে, কমনওয়েলথ সম্মেলনে, সার্ক অধিবেশনে এবং সর্বোপরি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এছাড়া, আশির দশক থেকে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই, এস. আই. ভারতে অন্তর্ঘাত ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানী আন্দোলনে পাকিস্তানের প্ররোচনা অনস্বীকার্য। এরই পরিণতি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা (১৯৮৪ খ্রি.)।

Unit 2

Impact of Cold War Relations: Between Russia and America in the Sub-Continent

ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, ভারতবর্ষে মার্কিনী সেনার সংখ্যা ছিল প্রায় 250,000। তবে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত মনযোগ ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ার দিকে সরিয়ে নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সমস্ত সামরিক, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছিল ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ায়। এইসময় দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তার অত মনোযোগ ছিলনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে উদীয়মান ঠান্ডা লড়াইয়ের সাথে যুক্ত ভূ-রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক বিবেচনার কারণে 1947 সালের 15 আগস্ট ব্রিটেন নিজেই ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করে। এর পাশাপাশি ব্রিটেন ইতিমধ্যেই ভূমধ্যসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং মার্কিন সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে ভারতকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিউনিস্ট বিরোধীদের হাতে তুলে দিলে ভারতকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হওয়া থেকে বিরত করা যাবে। স্বাধীনতার সাথে সাম্প্রদায়িক নানা সমস্যার দরুন ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। দেশভাগের ফলস্বরূপ দুই দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিংসার সম্মুখীন হন এবং অসংখ্য মানুষকে নিজের ভিটে জমি ছেড়ে চলে আসতে হয় অন্য দেশে।

ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ ছিল দেশভাগ এবং বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ। সম্পূর্ণ পাঞ্জাব বা বাংলা না পাওয়ার ফলে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ অনেকাংশেই ক্ষুব্ধ ছিল। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে সপর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লেখের প্রয়োজন রাখে কাশ্মীর। কাশ্মীর, অনেকগুলি রাজ্যের মধ্যে একটি যা 1947 সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে রাজ চালিয়ে গিয়েছিল। কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্তান বা ভারতে যোগদানের বিরোধীতা করেছিলেন। তবে পরে পাকিস্তান-সমর্থিত বিদ্রোহের ফলস্বরূপ, মহারাজা ভারতে "সাময়িক" যোগদানের বিনিময়ে সাহায্যের জন্য নতুন ভারত সরকারের দিকে ফিরে যান এবং স্থির হয় কাশ্মীরের ভবিষ্যতের বিষয়টি একটি গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তবে গণভোট কখনই ঘটেনি এবং ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ সফলভাবে পার্বত্য অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে। ভারত এবং পাকিস্তান উভয় কাশ্মীরে সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে এবং তথাকথিত "নিয়ন্ত্রণ রেখা" বরাবর একাধিকবার বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে।

ঠান্ডা লড়াই 1947-1979:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দুটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া দুটি ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়। একধারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পুঁজিবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তক এবং অন্যদিকে সোভিএট্ রাশিয়া ছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথপ্রদর্শক। বিশ্বের একাধিক দেশ দুটি পৃথক শিবিরে ভাগ ও হয়ে হয়েছিল মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বে। তবে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ কোনো পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল ভারত। তবে বলাবাহুল্য, এই ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখের পরিচয় রাখে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারত-পাক সম্পর্ক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1947 সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি সীমিত আগ্রহ নিয়েছিল। 1945 সালের পরপরই, ওয়াশিংটনের প্রাথমিক ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগ ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়াকে নিয়ে। তবে 1949 সালের শেষের দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার সাথে এবং 1950 সালে কোরিয়ান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ধারণা পরিবর্তন হতে শুরু করে। 1950 এর দশকের শুরুতে, কিছু নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকদের বক্তব্য অনুযায়ী মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পর্বে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত এশিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। 1950 এর দশকে, নেহরুর আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সংসদীয় গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সোভিয়েত, পশ্চিম ইউরোপ এবং চীনা সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলির দ্বারা প্রভাবিত আদর্শের সংমিশ্রণের প্রতি নেহেরুর প্রতিশ্রুতি, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতকে বিষয় রাজনীতির এক

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করে। এই সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু চিন্তাবিদদের মতে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই চিন্তামতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নেহরুর সরকারের সাথে সম্পর্ক জোরদার করে, তাহলে ওয়াশিংটন নিশ্চিত করতে পারে যে ভারত তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী (Democratic Capitalist) উন্নয়নের নোঙর এবং মডেল হিসেবে কাজ করবে- যাতে দৃঢ়ভাবে সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের মোকাবিলা করা যায়।

তবে মার্কিন কূটনীতিবিদদের মতে, সামরিক-কৌশলগত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর কাছে পাকিস্তান ছিল এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতি-রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পাকিস্তানের নৈকট্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে তার ভৌগোলিক অবস্থান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। 1954 সালের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি হয়। 1954 সালে গঠিত South-East Asia Treaty Organization এবং 1955 সালে বাগদাদ চুক্তিতে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের দ্বারা মার্কিন-পাকিস্তান সম্পর্ক আর এক ধাপ এগিয়েছিল। মার্কিনী সামরিক সহায়তা পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল তবে সামরিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে পাকিস্তান সামরিক আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিল ভারতকে।

বলাবাহুল্য, 1953 সালে, নেহেরু কাশ্মীরে পরিকল্পিত গণভোট বাতিল এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত সামরিক জোটকেই দায়ী করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভারত সরকার চীন সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মস্কোর সাথে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক আরও গভীর করেছিল। এই পরিবর্তনগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তান থেকে কিছুটা দূরে সরে যায় এবং 1950 এর দশকের শেষের দিকে ,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিন্তিত ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উদার বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় সরকারী বৃত্তে প্রভাব বিস্তার করছে। তৎকালীন সময়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ছিল যে যদি ভারত সরকার তার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে-এবং ভারতের সেই অর্থনৈতিক পতন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিসরে চীনা সরকারের মর্যাদাকেও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার (1953-1960) এবং বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির (1961-1963) প্রশাসন ভারতে মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য বাড়িয়েছিল, পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ভালো করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করার চেষ্টা করেছিল। জেনারেল, পরে ফিল্ড মার্শাল, আইয়ুব খানের (1958-1969) সামরিক শাসনের অধীনে পাকিস্তানে আপাত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে, ভারত ও পাকিস্তান, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়, 1960 সালে সিন্ধু নদের জল ভাগাভাগি নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল । তবে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আরও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যখন 1962 সালে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত পরাজিত হয় (মার্কিন সহায়তা সত্ত্বেও), পাকিস্তানী নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার সামরিক সক্ষমতা তাদেরও রয়েছে। 1965 সালে, যে সময়ের মধ্যে নেহেরু (যিনি 1964 সালের মে মাসে মারা গিয়েছিলেন) মারা যাওয়ার পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (1964-1966) প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন, আইয়ুব খান সেইসময় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল । যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর, 1965 সালের সেপ্টেম্বরে, পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির আহ্বানে সম্মত হয়। তবে পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় আলোচনা পর্বে কাশ্মীর ইস্যুতে উভয় পক্ষের (ভারত ও পাকিস্তান) অবস্থান পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়।

1965 সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, ওয়াশিংটন উভয় পক্ষের সমস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিত করে। এমনকি PL480-এর অধীনে খাদ্য সহায়তা—একটি সরকারি কর্মসূচি যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে

বাণিজ্যিক রপ্তানিকে সমর্থন করে, সেই কর্মসূচির আওতায় তারা কেবলমাত্র কয়েক মাসের খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করেছিল। 1965 সালের পর, প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের সরকার (1963-1968) পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সহায়তা এবং সরাসরি সম্পৃক্ততা সীমিত করার চেষ্টা করেছিল। এদিকে, 1960 এর দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অস্থিতিশীল হতে থাকে। বিশেষ করে, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকার (1969-1971) পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র দমন-পীড়ন শুরু করে। এই ঘটনাগুলি অবশেষে 1971 সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী (1966-1977, 1980-1984), ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি যোদ্ধাদের সহায়তায় পাঠান এবং মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা প্রদান করেন। এর পর অবশ্য মিসেস গান্ধী এবং পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর (1971-1977) মধ্যে একটি শীর্ষ বৈঠক হয় এবং তারা ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য নিরসনে সম্মত হন কাশ্মীরে বিদ্যমান যুদ্ধবিরতি লাইনের (Line of Control) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যদিও এরপরের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর এবং অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একাধিকবার সংঘাত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অলোক কুমার ঘোষ
প্রণব কুমার চ্যাটার্জি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.অলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০১২, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক,২০১২।

2.প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, হাওড়া: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১|

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. Write an essay on martial politics of Pakistan and how did it impact its relation with India?
2. How did cold war leave its impact on India-Pakistan relationship in post independent era.

Block 2

Kashmir Issue

Unit 3,4,5

Unit 3: Origin and Development: Role of the National Conference led by Sheikh Abdullah
Unit 4: Foreign Intervention and attempts of making it an international issue
Unit 5: The Terror Tactics: - Kargil War and its consequences

উদ্দেশ্য

সূচনা

কাশ্মীরি সমস্যার সূত্রপাত

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

কাশ্মীরী সন্ত্রাস

পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা থেকে কার্গিল যুদ্ধ:

পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা

কার্গিল যুদ্ধ

উদ্দেশ্য:

এই পর্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. কাশ্মীরি সমস্যার সূত্রপাত সম্পর্কে

২. কাশ্মীরি সমস্যার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্ব সম্পর্কে

৩. কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের উত্থান সম্পর্কে

৪. পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা এবং কার্গিল যুদ্ধ সম্পর্কে

সূচনা :

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারলেও, পাকিস্তান কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। একাধিকবার সামরিক এবং বেসামরিক শাসনের দ্বন্দ্বে জর্জরিত পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিতও নড়বড়ে। দিল্লি-কেন্দ্রিক কংগ্রেসীয় গণতান্ত্রিকতা ভারতে আগে থাকতেই তৈরি হয়েছিল, খণ্ডিত ভারত সেই ঐতিহ্য পেয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান তা পায়নি।

ক্রমাগত সামরিক শাসনের চাপে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান দ্বন্দ্বে এবং কিছু অভিজাত শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকায় পাকিস্তানে কোনও জোরালো মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠেনি। ফলে ধর্মীয় মৌলবাদের এবং উগ্রবাদী চিন্তাভাবনার উর্বরভূমি হয়ে উঠেছে পাকিস্তান আর যেটুকু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ঠাট বজায় রাখতে হয়েছে, তা রেখেছে স্বৈর-সমর-শাসকরাই। এই অবস্থায় নাগরিক সমাজের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে তারা তিনটি জিনিসের ওপর বরাবর নির্ভর করেছে যথা- এক, ভারতবিরোধী মনোভাব, দুই, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং তিন, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের সাথে দ্বন্দ্ব ।

কাশ্মীরি সমস্যার সূত্রপাত

ভারত ও পাকিস্তান দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ ছিল কাশ্মীর সমস্যা। ভারত স্বাধীনতালাভ করার সময় দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত বা পাকিস্তান কারোর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৪৭-৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৫৫৫টি ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান করে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যতিক্রম হল কাশ্মীর রাজ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কাশ্মীর তখনও একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই স্বীকৃত ছিল। কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের পক্ষে যাবে তা নিয়ে সেই সময়ের রাজা হরি সিং দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে পাকিস্তান সরকার মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের শাসক হিসেবে রাজপুত রাজাকে কিছুতেই মেনে নেবে না। অন্যদিকে যেহেতু ভারতের জাতীয়তাবাদী দল গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিল, সেই কারণে ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে হরি সিং-এর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই দুই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে হরি সিং কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম সশস্ত্র উপজাতিগোষ্ঠীর কাশ্মীর অভিযানের ফলে দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে।

দুটি কারণ কাশ্মীরের এই সশস্ত্র মুসলিম অভিযানের পিছনে কার্যকর ছিল। প্রথমত, হরি সিং-এর শাসনে হিন্দু ভূস্বামী গোষ্ঠী যথেষ্ট অত্যাচারী হয়ে ওঠায় মুসলিম সাধারণ মানুষ এই হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার জন্য হরি সিং পাতিয়ালা বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। হরি সিং-এর নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীরা এবং পাতিয়ালা বাহিনীর সদস্যরা অত্যাচার করতে থাকায় কাশ্মীরের মুসলিম উপজাতি গোষ্ঠী পাকিস্তানের সাহায্যে এর প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের পশ্চিম অংশে এই সময়ে গুজব রটানো হয় যে হরি সিং বিক্ষোভ দমনের জন্য ভারতীয় বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার যেহেতু কাশ্মীরকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে চায় সেই কারণে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরের জঙ্গি উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান করার ব্যাপারে সে প্ররোচনা দেয় ও সক্রিয় সাহায্য করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর কাশ্মীরে উপজাতি আক্রমণ ঘটে এবং বাধ্য হয়ে হরি সিং ভারতের সাহায্য চান। ২৭ অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং হরি সিং-এর প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতাপত্রটি "Instrument of Accession' নামে পরিচিত। কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যোগ দয়। কিন্তু বলা হয় যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থায় কাশ্মীর একটি পৃথক মর্যাদা ভোগ করবে। অর্থনীতি, বিদেশনীতি এবং প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা হবে। ভবিষ্যতে কাশ্মীরে গণভোটের আয়োজনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে কাশ্মীর ভারত অথবা পাকিস্তান কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যতদিন না এই গণভোট আয়োজিত হয় ততদিন কাশ্মীরকে পৃথক মর্যাদা দেওয়া হবে এবং কাশ্মীরে নির্বাচিত শাসককে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানও দেওয়া হবে। কাশ্মীরের এই স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি পরে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ২ নভেম্বর একটি বেতার ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে পশ্চিমী হানাদারদের হাত থেকে কাশ্মীর মুক্ত হওয়া মাত্রই তার জনগণের কাছে চূড়ান্ত রায় চাওয়া হবে। পরে ১৯৫২ সালের ১৯ জুন রাষ্ট্রপতিকে নেহরু লেখেন, "We are committed to abide by the decision of the people of Kashmir, whatever it might be. We are committed, secondly, to a plebiscite", ১৯৪৮ সালের মধ্যেই কাশ্মীরের ২/৩ ভূখণ্ড ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে যখন যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় সেই সময়ে ১/৩ ভূখণ্ড পাকিস্তান সমর্থিত হানাদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই অংশটি পরিচিত হয় আজাদ কাশ্মীর নামে। দুই অংশের মধ্যবর্তী সীমানা নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of Control, সংক্ষেপে LOC) হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ তাকে আন্তর্জাতিক সীমানার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় পাকিস্তান দাবি করতে থাকে যে যেহেতু কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীরা ভারতের বিরুদ্ধে, সেই কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তি এর একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান, অন্যদিক ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কাশ্মীরের জনগণের রায় পৃথকভাবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার আগে অধিকৃত ১/৩ অঞ্চল থেকে পাকিস্তান তার সমর্থিত হানাদারদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। এইভাবেই স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাশ্মীর একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে ভারত দুই মেরু রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছিল। তাতে আমেরিকার শিবিরে যোগ দিয়ে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের সুযোগ পেয়ে যায় পাকিস্তান। পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্র যতই অর্থ ও অস্ত্র যুগিয়ে যায়, ততই পাকিস্তানের রাজনীতি হয়ে ওঠে সেনানির্ভর, ঝোঁক বাড়ে সামরিক একনায়কতন্ত্রের দিকে। ফলে বাধ্য হয়েই ভারতকে ঝুঁকতে হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দক্ষিণ এশীয় সংস্করণে পরিণত হয় ভারত ও পাক সম্পর্ক, আর ইচ্ছে না থাকলেও সেই লড়াইয়ের চাপ নিতে হয় ভারত ও পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্রকেই। এতে বাড়তি মাত্রা যোগ করে চিন। একদিকে মার্কিন আধিপত্য আর অন্যদিকে 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ'-এই দুইয়েরই উপমহাদেশীয় প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে সে পাকিস্তানকে মদত দেওয়ার চেষ্টা

করে। এর আভাস পাওয়া যায় সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বেধে যাওয়া ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে আর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ প্রশ্নে ঘটে যাওয়া ভারত-পাক লড়াইয়ে।

১৯৪৭ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছরই পাকিস্তান কাশ্মীরে ভারতের নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন করে এসেছে। ১৯৬৩ সালে সে এই ধরনের হামলা করে ৪৪৮ বার, ১৯৬৪ সালে ১৫২২ বার এবং ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ১৮০০ বার। ঐ বছরই ৯ এপ্রিল গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের 'বদ্ধ সাগরের মতো বিরাট জলাভূমি' রান-এ পাকিস্তান হামলা করেছিল। ১ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক ভারতকে সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, শীঘ্রই পাকিস্তান ছাম্ব অঞ্চলে 'অপারেশন গ্র্যান্ড স্লাম' করবে। সত্যি সত্যিই সেই দিনই যুদ্ধ শুরু করে পাকিস্তান। সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিল আখনুর আক্রমণ করা, সঙ্গে সঙ্গে ঝটিতে জম্মুতে ঢুকে কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ভারতের প্রতিরোধে পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব য়ুথান্টের আপ্রাণ চেষ্টায় নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয় ২২ সেপ্টেম্বর, বাইশ দিনের ভারত-পাক যুদ্ধ থাকে ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। রাশিয়ার উদ্যোগে ভারত-পাক শান্তি সমঝোতা হয় রুশ-এলাকা তাসখন্দে। তাসখন্দ ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি।

ভারত-পাকিস্তানের দ্বিতীয়বার মুখোমুখি লড়াই হয় ১৯৭১ সালে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ জাতিবিরোধ ১৯৭০-৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারা নিয়েছিল। ভারত সেই সুযোগে সামরিক কূটনীতি ব্যবহার করে পাকিস্তানের খণ্ডীকরণকে ত্বরান্বিত করেছিল। সে ভেবেছিল, এতে দুর্বল পাকিস্তান পশ্চিমভাগে নমনীয় হবে, তাতে ভারতের সীমান্ত প্রতিরক্ষার চাপ কমে আসবে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক উল্টোটাই ঘটে, পাকিস্তানের মনোভাব আরও কঠোর হয়, তার সামরিক কূটনীতির প্রায় পুরোটাই কাশ্মীরী জঙ্গিদের পূর্ণ সামরিকায়ন ঘটিয়ে ভারতকে বিচ্ছিন্নতার রাজনৈতিক জটিলতায় ফেলে তাকে বিপর্যস্ত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়। এ কাজে পাকিস্তান সমর্থন পায় আমেরিকার কাছে, কেননা ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙ্গে যাওয়ার পরও চিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর নতুন গজিয়ে ওঠা ইসলামি প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানকে হাতছাড়া করা মার্কিনিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে ১৯৮০-র দশক থেকে ভারত-পাক সম্পর্কের কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে উঠেছিল কাশ্মীর। 'সার্ক' (SAARC) যে তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি, তারও কারণ এই কাশ্মীর। দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা তাই কাশ্মীর সমস্যার বিশ্লেষণ ছাড়া অসম্পূর্ণ।

ডোগরা রাজা গুলাব সিং ১৮৪৬ সালে অমৃতসর সন্ধির দৌলতে ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কাশ্মীর কিনে নিয়েছিলেন। তারই বংশধর হরি সিং-এর সাম্প্রদায়িক শাসনের সময়ে, কাশ্মীরের বেশির ভাগ জমির মালিক হিন্দু পণ্ডিতদের মুসলিম বিরোধিতার প্রতিক্রিয়ায় কাশ্মীরী ছাত্ররা তৈরি করেছিল মুসলিম কনফারেন্স, লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় অত্যাচার মুক্ত কাশ্মীর। এই মুসলিম কনফারেন্সই পরে ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়। শেখ আবদুল্লা ছিলেন এই দলেরই নেতা।

১৯৪৪ সালে সোপর বারামল্লাতে ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর বার্ষিক সভায় শেখ আবদুল্লা তাঁর স্বপ্নে দেখা 'প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড' 'নয়া-কাশ্মীর'-এর দলিল পেশ করেন। এটা ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক-প্রতিটি ক্ষেত্রে কাশ্মীরকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা। এই দলিলের সংবিধান অংশে ছিল ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সমান অধিকারের কথা। ঘোষিত লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বনির্ভরতা, জীবনের মানোন্নয়ন ও ব্যবহারমুখী উৎপাদন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশে কৃষি আর শিল্পকে ঘিরে ছিল নানা কর্মসূচি: জমিদারির বিলোপ, চাষির হাতে জমির অধিকার, শিল্পের জাতীয়করণ, একচেটিয়া প্রথার অবসান ইত্যাদি। কিন্তু এই পরিকল্পনা কনফারেন্সের দাবি হিসেবে হাজির করার আগেই ঘটে যায় ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তর।

কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ ছিল এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি দুটি কারণে অত্যন্ত জরুরি ছিল। প্রথমত, কাশ্মীর ভূখণ্ডে অধিকাংশ জমি হিন্দু ভূস্বামীদের দখলে ছিল এবং ঐসব ভূস্বামী ও কাশ্মীরী পণ্ডিতদের জোরালো চাপ ছিল ভারতীয় নেতৃত্বের ওপর। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রচরিত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকটিকে শক্তিশালী করে তুলবে, এই বিশ্বাস ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাদের মনে দৃঢ়মূল ছিল। এর ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করত পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব। কাশ্মীরের মতো একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য যদি পাকিস্তানের পক্ষে যোগ না দেয় তাহলে সেটা হবে পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতি সবচাইতে বড়ো আঘাত। এই কারণেই কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি মেনে নেওয়া পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃত মহম্মদ আলি জিন্না তাই ঘোষণা করেছিলেন, "Politically and economically Kashmir is the nerve centre of Pakistan". কাশ্মীরের জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লার কাছে বিষয়টির তাৎপর্য ছিল অন্যরকম। হরি সিং-এর রাজত্বের শেষ পর্যায়ে রাজপুত শাসনের বিরোধিতা করবার জন্য শেখ আবদুল্লাকে জেলে যেতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ আবদুল্লা ভারতে যোগদানের কথা বলতে থাকেন। তবে আবদুল্লার এই ভারত ভুক্তির সমর্থনের কারণ ছিল অন্য। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে কোনও একজন শাসকের স্বৈরাচারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট হবে বলে তিনি মনে করতেন। কারণ প্রথম থেকেই ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, একমাত্র ভারতের সঙ্গে যোগ দিলেই এবং ভারতের বিশাল বাজারের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত হলেই কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই কারণেই তিনি তাঁর দলের নতুন নামকরণ করেছিলেন National Conference যাতে তার পেছনে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় গোষ্ঠীর সমর্থনই বজায় থাকে। তাছাড়া কাশ্মীরের গণভোটের আশ্বাসের ওপরেও তিনি আস্থা রেখেছিলেন। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগদানের পর শেখ আবদুল্লাকেই কাশ্মীরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু শেখ আবদুল্লার সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য শেখ আবদুল্লা ব্যাপক ভূমিসংস্কার শুরু করেন। এই ভূমিসংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারত সমর্থিত হিন্দু ভূস্বামী গোষ্ঠী। তাদের এবং কাশ্মীরের পণ্ডিতদের চাপে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শেখ আবদুল্লাকে ভূমিসংস্কার থেকে বিরত হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। আবদুল্লা সেই উপদেশ গ্রহণ না করায় তাঁর বিরুদ্ধে ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে পাঠানো হয়। বলা যেতে পারে যে, কাশ্মীরের উত্তেজনার সূত্রপাত এই ঘটনা থেকেই। এই সম্পর্কে ভারতীয়দের নেতৃত্বের রাজনৈতিক দ্বিধা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের বিরোধের রাজনৈতিক কারণ ছিল। রাষ্ট্রসংঘের যে সিদ্ধান্ত অনুসারে কাশ্মীরে সংঘর্ষ বন্ধ করা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তের প্রধান অংশ ছিল তিনটি। প্রথমত, সংঘর্ষের দ্রুত নিষ্পত্তি। দ্বিতীয়ত, ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং তৃতীয়ত, গণভোটের উদ্যোগ। কিন্তু ১৯৫০ সালের মধ্যেও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার বা গণভোটের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং এর জন্য ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই সমান দায়ী ছিল। ভারতীয় উপস্থিতি শেখ আবদুল্লার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ভারত সরকারের কাছে কাশ্মীর সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ঘোষণা চেয়েছিলেন। অবশেষে ১৯৫২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয় যা Delhi Agreement নামে পরিচিত। ঐ বছর ১ আগস্ট কাশ্মীর আইনসভায় সমঝোতা পত্রটি অনুমোদিত হয়। এই সমঝোতাপত্রে মূল শর্ত ছিল পাঁচটি-(ক) কাশ্মীরে কোনও বংশানুক্রমিক শাসন থাকবে না, (খ) ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কোনও ভারতীয় আইন কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে কিনা তা কাশ্মীর সরকার ও আইনসভার অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে এবং কাশ্মীরের এই অধিকারকে বলা হবে "Concurrence Power", (গ) কাশ্মীরে জন্ম এরকম নাগরিকদের জন্য বিশেষ কাশ্মীরী নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, (ঘ) ভারতের জাতীয় পতাকার পাশাপাশি কাশ্মীরের নিজস্ব পতাকা একই মর্যাদায় ভূষিত হবে এবং (৩) কাশ্মীর সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে ভারতীয় সংবিধান সাধারণভাবে কাশ্মীরে প্রযোজ্য

হবে। এই সমঝোতা অনুমোদনের পরেই শেখ আবদুল্লা নিজের প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বীকৃতি ভারত সরকার ও কাশ্মীর আইনসভার কাছ থেকে আদায় করে নেন। সেইসঙ্গে ঠিক হয় যে কাশ্মীরের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হবেন কাশ্মীরের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের থেকে নির্বাচিত কোনও ব্যক্তি। তাকে বলা হবে 'সদর-ই-রিয়াসত' এবং তিনি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন না। কিন্তু এইখানে শেখ আবদুল্লার অস্বস্তি বেড়ে যায়, কেননা প্রথম সদর-ই-রিয়াসৎ হন ন্যাশনাল কনফারেন্স বিরোধী ভারতীয় করণ সিং। করণ সিং-এর মাধ্যমে শেখ আবদুল্লার ভূমিসংস্কার নীতির ওপর ভারত সরকারের আপত্তি আসার ফলে তিনি কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কাশ্মীর যাতে ভারতের সঙ্গে মিশে না যায় সেজন্য সচেষ্ট হন। আবদুল্লার এই মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে মার্কিন সরকার। কারণ কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে রুশমুখী ভারত সরকারকে সমস্যায় ফেলার একটি পরিকল্পনা আমেরিকার ছিল। এ ব্যাপারে নেহরুর উপলব্ধি ছিল এইরকম: "The whole Kashmir issue is apparently tied up in the American mind with Russia, China, Indo- China and the rest of it", এর আগেই ১৯৪৮ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে মার্কিন কূটনীতিক Warren Austin শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত Henderson মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন সেই রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন, "In discussing future of Kashmir Abdullah was vigorous that it should be independent", এরপর ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আসেন আরেকজন কূটনীতিক Adlai Stevenson। ভারত সরকার এই ঘটনাগুলিকেই আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করে এবং ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে পাঠানো হয়।

এরপর বিভিন্ন সাংবিধানিক আইন পাশ করে ভারত সরকার কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৫৪ সালে Constitution Order-এর মাধ্যমে বিচার বিভাগীয়, রাজস্ব বিভাগীয় এবং যোগাযোগ সম্বন্ধীয় বিষয়ে কাশ্মীরের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে কাশ্মীরকে ভারতীয় লোক গণনার আইনের আওতায় আনা হয়। ১৯৬০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে কাশ্মীরের বিচারের সর্বোচ্চ আদালত বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের ওপর ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৫ সালে ভারতের শ্রম আইন কাশ্মীরেও প্রযোজ্য হয়। ১৯৬৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'সদর-ই-রিয়াসৎ'-এর পদ অবলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির মনোনীত রাজ্যপালকে কাশ্মীরের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে পরিণত করা হয়। এই ১৯৬৬ সাল থেকেই কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীকে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বলা হতে থাকে।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অবশ্য কাশ্মীরের National Conference-এর সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু এর মূলে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শেখ আবদুল্লার রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ। আবদুল্লার এই নতিস্বীকারের পর তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১৯৭৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে তাঁর একটি চুক্তি হয়। এই Kashmir Accord অনুসারে শেখ আবদুল্লা আবার কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৮২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই পুত্র ফারুখ আবদুল্লা। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ফারুখ আবদুল্লাকে আবার ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার জায়গায় বসানো হয় গুলাম মহম্মদ শাহকে। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি একেও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন এবং জগমোহনকে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৮৭ সালে ফারুখ আবদুল্লা আবার আপস রফার মাধ্যমে এবং প্রায় জোর করেই নির্বাচনে জয়লাভ করে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীত্ব ফিরে পান।

Unit 4: Foreign Intervention and attempts of making it an international issue

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

কাশ্মীর প্রশ্নে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা আদৌ সন্তোষজনক নয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান দুই রাষ্ট্রকে পরিস্থিতির যাতে কোনরকম অবনতি না হয় সে বিষয়ে নির্দেশ দেয়। কিন্তু পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কাশ্মীরে সেনা সমাবেশ করে। নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তিন সদস্যবিশিষ্ট এক তথ্যানুসন্ধান কমিশন গঠনে উদ্যোগী হয়। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠন করে যা UNCIP (ভারত ও পাকিস্তানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশন-U. N. Commission for India and Pakistan) নামে পরিচিত। এই কমিশন কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই আগস্টের প্রস্তাবে তিনটি বিষয় উল্লেখিত হয়- যুদ্ধবিরতি, সেনা প্রত্যাহারের জন্য চুক্তি সম্পাদন ও কাশ্মীরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। উল্লেখ্য গণভোটের কথা এই প্রস্তাবে অনুচ্চারিত ছিল। ৫ই জানুয়ারী (১৯৪৯ খ্রি.) কমিশন দ্বিতীয় প্রস্তাবে গণভোটের পদ্ধতিগত দিকটি তুলে ধরা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভারত ও পাকিস্তানের উভয়েই এই দুটি প্রস্তাবকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ পরিস্থিতির জটিলতা নিরসনে ব্যর্থ হন। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা শুধুমাত্র আঞ্চলিক সমস্যাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, প্রথম থেকেই ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিল না, বরং নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। নেহরু সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে পাকিস্তানকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সংযত করলে ভারত-পাক সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারত। নেহরুর মতে "Perhaps this critical situation between India and Pakistan would not have arisen but for the policies pursued by the UK and USA Governments in regard to the Kashmir dispute. They have consistently encouraged the intransigence of Pakistan." (মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত নেহরুর পত্র, ১ আগস্ট, ১৯৫১, Letters to Chief Ministers, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮)। নেহরু পাকিস্তানকে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর পক্ষপাতপূর্ণ নীতির মূলে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন দিয়ে এসেছিল এবং এখন সেই নীতির সূত্র ধরেই কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানকে উৎসাহিত করছে। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থ মজবুত করার জন্য এবং সম্ভাব্য সাম্যবাদী প্রভাব প্রতিরোধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী সচেতনভাবে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জাতিগুলিকে কাছে টানতে চাইছে। পাকিস্তানকে এই মধ্যপ্রাচ্য বলয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই কাশ্মীর প্রশ্নে তারা সহানুভূতি দেখাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে নেহরুর ৭ই জুলাই, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ ও ১ আগস্ট, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পত্রে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গ-মার্কিন অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। ইঙ্গ-মার্কিন মদতে পাকিস্তান অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। এমনকি তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' নেতা সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ হুমকি দিলেন যে ভারত কাশ্মীর ত্যাগ না করলে পুনরায় ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ (Jehad) শুরু করা হবে (৩০শে জুন, ১৯৫১ খ্রি.)।

ইতিমধ্যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ভারত- অনুসৃত শান্তিপূর্ণ জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের পর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের গুরত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-পরিচালিত পশ্চিমী শিবিরে ভারত-বিরোধী ধারণা সৃষ্টি হয়ে। ওদিকে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য পশ্চিমী শিবিরের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে এবং সিয়াটো ও বাগদাদ

সদস্যপদ গ্রহণ করে। ষাটের দশকে পরিস্থিতিতে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধ বাধে এবং চীনের গঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় পাকিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশে অস্থিরতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি সীমা অতিক্রম করলে কাশ্মীর প্রশ্নে পুনরায় ভারত-পাক যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ভারত অভাবনীয় সাফল্যলাভ করে। অবশ্য জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্পাদিত হয়। চীন-সোভিয়েত ভারত-পাক যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতি, তাশকেন্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হয়। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন-এর মধস্থতায় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আয়ুব খানের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার তাশখন্দ এ দ্বি-পাক্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাশখন্দ চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষ প্রাক-যুদ্ধবিরতি সীমারেখা মেনে নিতে রাজী হয় এবং অধিকৃত অঞ্চল থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয় তাশখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরেই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক তিরোধান হয়।

Unit 5: The Terror Tactics: - Kargil War and its consequences

কাশ্মীরী সন্ত্রাস

কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে সেখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মায় যে ঐ রাজ্যের উন্নতি নয় বরং ঐ রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করাই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য। কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদা হ্রাস এবং কাশ্মীরকে নিয়ে ভারতের অস্থির রাজনীতি সেখানকার সাধারণ মানুষের মনে ভারত বিদ্বেষের জন্ম দেয়। তাছাড়া শেখ আবদুল্লা ও ফারুখ আবদুল্লা তাদের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্যে যে আপস করেছিলেন সেই আপসের মূলে ছিল কাশ্মীরের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নেওয়া। এর ফলে কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাজ্যের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা সম্পর্কে একটি তিক্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এই মনোভাব থেকেই ১৯৮৭ সালে কাশ্মীরের একটি রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠনের জন্ম হয়। ইয়াসিন মালিক, আবদুল হামিদ, ইজাজ আহমেদ দার, জাভেদ নির, আমানুল্লা খান, মকবুল বাট প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF) নামে পরিচিত হয়। বলা যেতে পারে যে এটাই ছিল কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদের সূচনা।

পাকিস্তান নিজ স্বার্থে এই মুক্তি ফ্রন্টের সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য দেয়, তবে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ মুক্তি ফ্রন্টের কাম্য ছিলনা, স্ব-শাসন ও মুক্তি অর্জন কাশ্মীরের উগ্র জঙ্গীগোষ্ঠীগুলির প্রধান লক্ষ্য। হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠী পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হলেও মুক্তি ফ্রন্ট কাশ্মীরকে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ থেকে বিযুক্ত করে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে চেয়েছিল। মুক্তিফ্রন্টের প্রধান মহম্মদ ইয়াসিন মালিক আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী ২৭টি সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে হুরিয়াৎ সম্মেলন গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে একটি রাজনৈতিক মঞ্চের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধকে

পরিচালনা করা। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে জামাত-ই-ইসলামী নেতা সৈয়দ আল শাহ জিলানি হুরিয়াৎ সম্মেলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। জিলানি ভারতীয় সংবিধানের পরিকাঠামোর মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ঘোর বিরোধী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান উগ্রপন্থী হুরিয়াৎ মুজাহিদিনদের মাধ্যমে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিতে থাকে। ১৯৯০ থেকে কাশ্মীরে "ছায়াযুদ্ধ" (Proxy war) চলতে থাকে, এরই চূড়ান্ত পরিণতি সাম্প্রতিক কার্গিল যুদ্ধ।

কাশ্মীরের রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির সন্ত্রাসবাদী ও ইসলামীয় চরিত্র অর্জনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছিল। রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন তৈরি হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা বিভিন্ন দমনমূলক আইনের চরম ব্যবহার ক'রে এই বাহিনী যে অত্যাচার শুরু করে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই কাশ্মীরের ভারত রাষ্ট্র বিরোধী সন্ত্রাসবাদী প্রবণতা দেখা দেয়। এর সঙ্গে ধর্মীয় চরিত্র যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল কাশ্মীরের অধিকাংশ সাধারণ অধিবাসীর ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য এবং কাশ্মীরে প্রচারিত সুফি ধর্মমতের বিকৃত প্রাধান্য। এই পরিস্থিতিকে পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠী সুকৌশলে কাজে লাগায়। কাশ্মীরে পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামি দলের একটি ভ্রাতৃপ্রতিম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন গুলাম আহম্মদ আহার এবং সৈয়দ সাহাবুদ্দিন।'পাকিস্তানি জামাত-ই-ইসলামি'র প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আবুল আলি মাওদুদি পাকিস্তানকে প্রথমদিকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করতেন, কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে মনে করতেন না। এই মৌলানা মাওদুদি পরে তীব্র ভারতবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। পাকিস্তানকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ভাবতে শুরু করেন ও জম্মু-কাশ্মীরেও ইসলাম-এর প্রাধান্য বিস্তারের কথা বলতে থাকেন। কাশ্মীরের জামাত-ই-ইসলামি এই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের মাওদুদি গোষ্ঠীর প্রভাব পাকিস্তানি সেনার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তার ফলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ও সামরিক সরকার কাশ্মীরের ভারত-রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে মদত জোগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কাশ্মীরের জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়াউল হকের সময়ে। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি সুফিদের গুরুবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে একটি পর্যায়ে যখন মৌলবাদী প্রবণতার দিকে অগ্রসর হয় সেইসময়ে আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ কাশ্মীরকে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটি ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করে এবং কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে। তিনটি স্তরে কাশ্মীরের রাজনীতি আন্তর্জাতিক কূটনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত, পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের মাধ্যমে পাক-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে আরবের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সহায়তায় অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে এই মাদ্রাসাগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন কাশ্মীরী যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামি জেহাদি মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয় অন্যদিকে তেমনি অস্ত্র প্রশিক্ষণেরও বন্দোবস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাহায্য করা শুরু হয় কারণ এই অঞ্চলে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা। তৃতীয় স্তরের যোগাযোগটি ছিল আফগানিস্তান সংক্রান্ত। তখন সোভিয়েত বাহিনীর হাতে বিতাড়িত বহু আফগান গোষ্ঠী পাকিস্তানে এবং আজাদ কাশ্মীরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই আফগান গোষ্ঠীগুলিকেই মার্কিন মদতে পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করে। ১৯৮৭ থেকে ৯০ সালের মাধ্যে কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং এই সময়ে যেসব জঙ্গি গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে, সেগুলো হল আনসার-উল- ইসলাম, আলবদর নামান্তরে হিজাব-উল-মুজাহিদিন, হরকত্-উল-জিহাদি ইসলামি এবং হরকত্-উল-মুজাহিদিন। এই শেষের গোষ্ঠীটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে এবং একটি বিশেষ যোদ্ধা গোষ্ঠী গঠন করে যারা লস্কর নামে পরিচিত। ১৯৯০-৯৫ সালের মধ্যে এই লস্কর গোষ্ঠী পাকিস্তানের সামরিক শাসক অথবা সামরিক বাহিনীর মদতে "Cross Border Terrorism"-এর জন্ম দেয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় এবং তীব্র পাকিস্তান-বিরোধী জনমত তৈরি হওয়ায় কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয় এবং সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার অবলুপ্তির দাবি ওঠে। ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান উভয় দেশেরই আয়ত্বের বাইরে চলে যায়।

১৯৯২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সূত্রপাত করেন। কিন্তু এর কোনও ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়নি। তার কারণ কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের কট্টর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ভারতীয় নেতৃত্ব একদিকে যেমন কাশ্মীরকে একটি সামরিক রাজ্যে পরিণত করেছে আবার অন্যদিকে তেমনি JKLF-এর পাকিস্তান বিরোধী গোষ্ঠী বা হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে কিংবা কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদীকে মুক্তি দিয়ে কাশ্মীরের জনগোষ্ঠীকে ভারতের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যেহেতু সংবিধান সংশোধন করে কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদাকে অস্বীকার করাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দিয়েছে সেই কারণে কোনও প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তানের বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের আমলে আজাদ কাশ্মীরের দাবিকে সমর্থন করে পাকিস্তান কাশ্মীরকে তার পক্ষে টেনে নিতে চেষ্টা করেছে। নওয়াজ শরিফের এই প্রচেষ্টার কূটনৈতিক সাফল্যকে বানচাল করবার উদ্দেশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী লাহোর বাস কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগেই পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরবর্তী সামরিক শাসক কাশ্মীরের মৌলবাদী সন্ত্রাসকে আবার মদত দিতে শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই ব্যবহার করবার চেষ্টা করে বলে সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। একদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন আর অন্যদিকে পাকিস্তানে ইসলামিক কূটনীতির ওপর নির্ভরশীল সামরিক প্রশাসন ভারতের কাশ্মীর সমস্যাকে জটিলতম করে তুলেছিল, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে গৌণ হয়ে গিয়েছিল কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্নটি।

শুধু সন্ত্রাসবাদী প্রবণতার জন্যই যে কাশ্মীর ভারতের পক্ষে একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা নয়। কাশ্মীরের অন্তর্বর্তী নিয়ন্ত্রণ রেখাও ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐ নিয়ন্ত্রণ রেখা বা Line of Control (LOC) একধরনের জাতীয়তাবাদী আবেগের প্রভাবে একটি অবশ্যমান্য রেখায় পরিণত হয়েছে, অথচ তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব অত্যন্ত অস্থির এবং ভঙ্গুর। জম্মু ও পুঞ্চ (Punch) সেক্টরের পশ্চিমাংশ, পশ্চিম কাশ্মীর, গিলগিট ও বালুচিস্তান পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে এবং জম্মু-কাশ্মীর পুঞ্চের অন্য অংশ ও লাদাখ ভারতের নিয়ন্ত্রণে। এই দুই নিয়ন্ত্রণের মাঝখান দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণরেখা টানা হয়েছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ রেখা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর প্রথম এক দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিষয়টি সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিকে দেওয়া চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলে যে, ভারত রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেবে। কাশ্মীর সম্পর্কে সেখানকার মানুষের রায় মেনে নেবে। এবং সেইভাবে সীমান্ত নির্ধারণ করা হবে। নেহরু বলেছিলেন, "We want no forced marriage, no forced union", কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালের পর নেহরুর মনোভাব পাল্টে যেতে থাকে। তার কারণ ইতিমধ্যে পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে মার্কিন আধিপত্যবাদের ক্ষেত্র হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছে। পাকিস্তান SEATO-র সদস্য হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং চিন-ভারত পঞ্চশীল নীতির ঘোষণা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে চিন পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে। এই ঘটনাক্রমে নেহরুর মনোভাব পাকিস্তানের প্রতি কঠোর হয়ে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই একাধিকবার সংঘর্ষের পর পাকিস্তান ও ভারতের তৃতীয় সংঘর্ষ হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং সেখানে সামরিক শাসনেরও অবসান ঘটে। নির্বাচিত পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সিমলায় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে সম্পাদিত হয় সিমলা চুক্তি বা Simla Agreement (৩ জুলাই ১৯৭২)। এই চুক্তির দুটি প্রধান শর্ত ছিল। প্রথমত, কাশ্মীরকে নির্দিষ্টভাবে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, আগের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে যে ৩৫৪ বর্গমাইল এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করে নিয়েছিল সেই এলাকাকে পাকিস্তান ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলেই মেনে নিয়েছিল। এরপর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতের কোনও ঘোষিত যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে কাশ্মীরের রাজনীতি নিয়ে ভারত সরকারের মনোভাব কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছিল এবং তারই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান গোপনে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের নীতি বজায় রেখেছিল। এর অনিবার্য পরিণতি ছিল কাশ্মীরে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণরেখায় সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি এবং সেই সামরিক বাহিনীর অসামাজিক আচরণের ফলে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের ভারত বিরোধিতা। সীমান্তের কথা মাথায় রেখেই ভারত সরকারও পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য পাকিস্তানও মার্কিন মদতে একই ধরনের পরীক্ষা চালাতে থাকে।

ভারত ও পকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা চললেও কাশ্মীর প্রশ্নে অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। কাশ্মীরে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার জন্য ভারত সরকার দুই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একটি হল সামরিক তৎপরতার মাত্রা বৃদ্ধি করা হয় এবং উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত হয়। সরকারী হিসাব অনুসারে ২০,০০০ কাশ্মীরী রাজবন্দীকে বিভিন্ন কারাগারে রাখা হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে প্রায় ৫০,০০০ ব্যক্তি সামরিকবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। এর পাশাপাশি কাশ্মীরে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ফারুখ আবদুল্লা পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর জাতীয় কনফারেন্স দল জম্মু-কাশ্মীরে ৮৭টি আসনের মধ্যে ৫৫টিতে জয়যুক্ত হয়। এদিকে কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের ওপর উগ্রপন্থীদের হামলা অব্যাহত ছিল তখনও। জঙ্গীদের হানায় ডোডা জেলার ১৫ জন পণ্ডিত নিহত হন (জানুয়ারী, ১৯৯৬ খ্রি.)। এরপর জানুয়ারী (১৯৯৮ খ্রিঃ) ২৩ জন কাশ্মীরী পণ্ডিতের জীবনহানি ঘটেছে।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি এতটা সংকটজনক হয়ে উঠেছিল যে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চীন-ভারত সংঘর্ষে ও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতের যে সংখ্যক সেনার জীবননাশ হয়েছিল তার তুলনায় কাশ্মীরে জঙ্গীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আরও বেশি সেনার জীবনহানি ঘটে। উগ্রপন্থী তৎপরতার মোকাবিলায় কাশ্মীরে প্রায় ১২,০০০ সেনা নিহত হয়েছিল। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গী সংগঠনগুলো ভারতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্য আন্ত-সীমান্ত সন্ত্রাস (cross-border terrorism) ও ভারতের ভেতরে জঙ্গী সংগঠনগুলির তাণ্ডব এই দ্বিমুখী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল । ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুম্বাই শহরে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ভারতীয় সংসদে উগ্রপন্থী আগমন ঘটে। এরপর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে জঙ্গী হাঙ্গামার মাত্রা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে জঙ্গীরা নৃশংস হত্যালীলা চালায়। পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে ভারতের সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন প্রভৃতি জঙ্গী সংগঠনের নাশকতামূলক কার্যকলাপ যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের হুজি সংগঠনটিও জঙ্গী কার্যকলাপে লিপ্ত।

পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা থেকে কার্গিল যুদ্ধ:

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর কাশ্মীর সম্পর্কে আরও বেশি উগ্র নীতি অনুসরণ করেন এবং ১৯৮৪ সালে ভারত অঘোষিত সিয়াচেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরিস্থিতি শান্ত করবার জন্য চিনের প্রধানমন্ত্রী দেং জিয়াও পিং

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির আমলে একটি সমঝোতার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে না পারায় রাজীব গান্ধি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় এবং আরব জগৎ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে যায়। এর ফলে কাশ্মীরের আরও বেশি সামরিকীকরণ হয় এবং পাক-ভারত উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এই উত্তেজনা চরমে পৌঁছয় ১৯৯৬ সালে আখনুর সেক্টরে ভারত সীমান্তে বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করায়। ১৯৯৮ সালের পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রই পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিযোগিতা শুরু করে। যার অন্যতম উদাহরণ পোখরানের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ (১৯৯৮)। এই সময়ে বর্ধিত উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর লাহোর বাস কূটনীতি সফল হয়নি বরং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ভারতের বিরুদ্ধে দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছেন, এই পাকিস্তানি মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে পাক সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফ নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। প্রধানত এই পাক সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত অনুসারেই নওয়াজ শরিফ ক্ষমতায় থাকাকালীনই কারগিল যুদ্ধে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৯৯৯)।

বিশ্লেষকদের অনেকেই অবশ্য কারগিল যুদ্ধের প্রসঙ্গে সিয়াচেন বিতর্কেরও উল্লেখ করেন। পাকিস্তান দাবি করে, সিয়াচেন থেকে আরও উত্তরে কারাকোরামের প্রান্ত পর্যন্ত এলাকা তারই। ভারত তা কখনওই মানেনি। তর্কের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে। ঐ সময়ে যেসব আন্তর্জাতিক মানচিত্র প্রকাশিত হয় সেগুলোর বেশিরভাগেই সিয়াচেন সম্পর্কে পাকিস্তানের দাবি কিছুটা মান্যতা পায়। ''National Geographic Society-র 'Atlas of the World', শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'A Historical Atlas of South Asia' কিংবা 'The Times Atlas of World'-এ সিয়াচেন হিমবাহকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তাতে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতেই পারে। পাকিস্তান তাই ১৯৮৫ সালের মানচিত্রে সিয়াচেনকে তাদের বলে দেখানোর সুযোগ পেয়ে যায়। এমনকি ভারত থেকে প্রকাশিত দুই বইয়ে যেভাবে সিয়াচেনের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বিতর্ক বেড়েছে বই কমেনি। বই দুটো হল রবি রিখো-র (Ravi Rikhye) The Fourth Round: Indo-Pak War in 1984 এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে. পি. চন্দেঘের (K. P. Candeth) The Western Front: Indo-Pakistan War in 1971। তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক সিয়াচেনের ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of Control-LOC) সরিয়ে দেওয়া চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সফল হননি, বরং ১৯৮৪ সালের সংঘাতের সূত্রে ভারত 'Saltoro Ridge' দখল করে সিয়াচেনের ওপর তার কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নেয়। তখনকার সেনা কমান্ডার মুশারফ ভারতীয় সেনাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অনেকে বলেন, মুশারফ সেই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতেই কারগিল যুদ্ধের ছক কষেছিলেন।

অবশ্য ঘোষিত যুদ্ধের মধ্যে কারগিল যুদ্ধকে ফেলা যায় কিনা, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। ভারতীয় সীমান্তের এপারে পাক-সেনার অনুপ্রবেশ আর তাদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনার অভিযান, এই ছিল কারগিল কাণ্ডের সারকথা। সম্প্রতি পাক-প্রেসিডেন্ট পারভেজ মশারফ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনী In the Line of Fire-এ পাক-সেনার ঢুকে আসার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন, দায়ী করেছেন ভারতীয় সামরিক প্রস্তুতিকে, আবার জড়িয়ে নিয়েছেন আগের পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকেও। স্বাভাবিক ভাবেই মুশারফের বক্তব্যকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর আত্মজীবনীতে প্রণব মুখোপাধ্যায় একে ব্যঙ্গ করেছেন 'মিথ্যার ফুলঝুরি' বলে।

পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা:

ভারতের পরমাণুনীতির ইতিহাস এক দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। এর চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ও ১৩ মে রাজস্থানের পোখরানে পাঁচটি পরমাণুবোমার বিস্ফোরণ বিগত চারদশকে ভারতের পরমাণুনীতির সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন-এই দুই বিপরীত ধরণার প্রতিফলন দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধুনা-বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যতীত এশিয়ার মধ্যে ভারতেই প্রথম শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান শুরু হয়। তবে ভারত ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব দেয়। পারমাণবিক অস্ত্র নয়, শান্তিপূর্ণভাবে পরমাণু শক্তির ব্যবহারের নীতির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

নেহরুর পরবর্তীকালে অবশ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধি উভয়েই অনুষ্ঠানিকভাবে পরমাণু অস্ত্র অর্জনের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেননি। এর কারণ হল ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে চীনের পারমাণবিক পরীক্ষা। চীনের পদক্ষেপ ভারতের নিরাপত্তার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে একথা বিবেচনা করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত পরমাণু অস্ত্র প্রসার-নিরোধক চুক্তিতে (NIT) স্বাক্ষনদোন করেনি। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভারত পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনা বাতিল। করেনি।

পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করার পথ খোলা রাখার নীতি বাস্তবায়িত হল ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। রাজস্থানে। পোখরানে ভারত প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। যদিও ভারত এই পরমাণু বিস্ফোরণকে শান্তিপূর্ণভাবে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি পদক্ষেপরূপে ঘোষণা করেছিল, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির এই ব্যাখ্যা মনঃপুত হয়নি। আন্তর্জাতিক মহলে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে ভারত সরকার এরপর পরমাণু বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেয়নি, তবে পরমাণু গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকে। এরপর আশির দশকে পরমাণু অস্ত্র ক্ষেপণের জন্য একটি সুসংহত ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মিত হয়। এইভাবে পৃথ্বি, নাগ, ত্রিশূল, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্র নির্মিত হয়। অগ্নির সীমা ২৫০০ কিলোমিটার। মনে প্রশ্ন জাগে যদি পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন না থাকত, তাহলে অগ্নির মতো পরমাণু অস্ত্র বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের যৌক্তিকতা ছিল না। এছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা পরমাণুবোমা পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভারত তার বিরোধিতা করে এবং নিষিদ্ধকরণের (CTBT)-তে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকে, ভারত সরকারের মতে এই চুক্তি বৈষম্যমূলক। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে পোখরানে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার সিদ্ধান্তটি একটি আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার পরমাণু পরীক্ষার পরিকল্পনা নেয়, তবে

শেষপর্যন্ত পরিকল্পনা রূপায়ণ থেকে সরে আসে। অবশেষে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মে ও ১৩ই মে রাজস্থানের পোখরানে যথাক্রমে তিনটি ও দুটি ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। এই বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে কোন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেনি। কেননা ভারত পারমাণবিক অস্ত্রসম্প্রসারণ চুক্তি ও সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা চুক্তি (CTBT) এর কোনটার শরিক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কেন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়? এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি যুক্তি

দেখানো হয়েছে। প্রথমত, মন হতে পারে বাজপেয়ী সরকার জন্মলগ্ন থেকেই কোয়ালিশনের শরিকদের চাপে বিব্রত হয়েছিল। তাই পারমাণবিকবোমা বিস্ফোরণের মতো চমকপ্রদ পদক্ষেপ নিয়ে সরকার দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী আবেগ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়।কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি ভুললে চলবে না। দক্ষিণ-এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত চীন দক্ষিণ-এশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে এক বড় বিপদ। চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান তার যুদ্ধাস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করে চলেছে। কিছুকাল আগে পাকিস্তান সদ্য নির্মিত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাউড়ি উৎক্ষেপণ করে। ঘাউড়ি উৎক্ষেপণ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে এক বিপদসঙ্কেত। এছাড়া পাকিস্তানের পারমাণবিকবোমা নির্মাণের গোপন কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা ফাঁস হয়ে যায়। আশ্চর্যের কথা পাকিস্তানের গোপন কর্মসূচীর চূড়ান্ত পরিণতিরূপে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাত্র এক পক্ষকাল পরেই ২৮শে মে ১৯৯৮ পাকিস্তান বেলুচিস্তানে পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

পরমাণুশক্তিধর দেশ বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের ঘোরতর সমালোচনা করেছে। কিন্তু পরমাণুশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল , তাই অন্যদেশের পারমাণবিক পরীক্ষার সমালোচনা করা নিঃসন্দেহে অনৈতিক ও দ্বিচারিতার পরিচায়ক। পোখরান বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সম্ভাবনার আশঙ্কা দেখা দেয়। তবে অনেকের ধারণা ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক শক্তিধর দেশরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু অমীমাংসিত বিরোধের বিষয় তোলার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না ঘটালে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের প্রকৃত উন্নতি ঘটবে না। তবে একথা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় যে ভারত আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতির ঐতিহ্য থেকে সরে এসে মেনে করা যুক্তিখবর ক্ষেত্রে দুর্বলতা কটিয়ে উঠে ভারত যে স্বাভিমান অর্জন করেছে তার ভিত্তিতে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পোখরান বিস্ফোরণের পর ভারত ও পাকিস্তান দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে আলোচনার পথ অনুসরণ করে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৯৮ খ্রি.) দুটি দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এর পরের বছর (১৯৯৯ খ্রি.) ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বাসযোগে সড়কপথে ঐতিহাসিক লাহোর যাত্রা সম্পন্ন করেন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে লাহোর ঘোষণার মাধ্যমে জানালেন পরমাণু-যুদ্ধ যাতে না বাধে সেজন্য দুই দেশ যথোচিত ব্যবস্থা নেবে। লাহোর ঘোষণায় জানানো হল (১) দুটি দেশের মধ্যে সংঘাত এড়াতে পরমাণু অস্ত্রে গুরুত্ব বুঝে দুটি দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে মজবুত করবে। (২) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ মানা হবে। (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের জন্য দুটি দেশ দায়বদ্ধ থাকবে। (৪) দুটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আস্থাসূচক বাতাবরণ গড়ে তোলা হবে। (৫) দুটি রাষ্ট্রই ২৭ বছর পূর্বে সম্পাদিত সিমলা চুক্তির ঐতিহ্যকে কার্যকর করতে সচেষ্ট হবে। (৬) এছাড়া দুই সরকার কাশ্মীরসহ অন্যান্য প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে।

কার্গিল যুদ্ধ:

লাহোর ঘোষণার তিনমাসের মধ্যে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে কাশ্মীরে সামরিক সংঘর্ষ বাধায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, বিগত এক দশক ধরে পাকিস্তান কাশ্মীরে ছায়াযুদ্ধ (Proxy war) অনুসরণ করে এসেছিল এবং কাশ্মীরের জঙ্গী সংগঠনগুলিকে সব ধরনের সমর্থন করে এসেছিল। পাকিস্তান সামরিক অনুপ্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করে কাশ্মীরী

মুজাহিদিনদের তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আসলে কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানের দুটি রণকৌশল আছে। একটি হল নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ও একইসঙ্গে তথাকথিত আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে প্ররোচিত করে পাকিস্তানের শর্তে ভারতকে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য করা। দ্বিতীয়ত, ভারতকে দুর্বল করে তোলার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাশকতামূলক কার্য পরিচালনা করা। এই নীতি 'Policy of thousand gates' নামে পরিচিত।

মে মাসের শেষদিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একথা সত্য, পাক-সেনারা নিজণরেখা অতিক্রম করে পর্বতশৃঙ্গগুলি দখল করে রাখায় ভারতীয় সেনারা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু ক্ষতি সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম না করে সীমান্তের এপার থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং দুর্ভেদ্য পর্বতগুলির চূড়া থেকে হানাদারদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। গুরুত্বপূর্ণ টাইগার হিল দখল করার পর কার্গিল যুদ্ধ অথবা অপারেশন বিজয়' চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক সাফল্য নয়, কার্গিল যুদ্ধের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হল পাকিস্তানের কূটনৈতিক বিপর্যয়। এতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর- প্রশ্নে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভারত কাশ্মীর প্রশ্নে বিশ্বরাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণ করেনি, উপরন্ত নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘনের জন্য সমালোচিত হয়। এছাড়া জি-এইট-ভুক্ত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আটটি রাষ্ট্র যৌথ বিবৃতিতে পাকিস্তানকে দোষী সাব্যস্ত করে। ইওরোপীয় ইউনিয়নের পনেরটি রাষ্ট্রও পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করে।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, কাশ্মীর সমস্যাকে পাকিস্তান বিশ্বজনীন ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া সকলেই এই সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। বিশ্বজনীন ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের প্রধান নিয়ন্ত্রক ওসামা বিন লাদেন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুই প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেন এবং এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক 'জেহাদ' পরিচালনার হুমকি দেন। কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের পশ্চাদপসরণ সেখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর প্রধান সেনাপতি পারভেজ মোশারফ প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুনরায় সামরিক শাসন বলবৎ করেন। বলাবাহুল্য, জেনারেল মোশারফ কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় মদত দিতে থাকেন।

কারগিল যুদ্ধের পরেও ভারত শান্তির পথে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। ২০০১ সালের জুলাই মাসে আগ্রায় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মুশারফের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ, চোরাচালান, অপরাধী প্রত্যর্পণ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-এইসব কোনও বিষয়ই আলোচনায় তুলতে দেননি পাক-প্রেসিডেন্ট। শুধু পাকিস্তানের শর্তে কাশ্মীর আলোচনার ব্যাপারে তিনি গোঁ ধরে থাকেন। ফলে শীর্ষ বৈঠক ভেস্তে যায়। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাভানা নির্জেটি সম্মেলনের সময় আর এক দফা ভারত-পাক শীর্ষ বৈঠক হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং উপমহাদেশীয় সন্ত্রাসবাদ দমনে 'যৌথ মেকানিজম'-এর প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে রাজি হয়েও পাক-প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে জুড়ে দেন কাশ্মীরের বিষয়টিও, কাশ্মীরের স্বশাসন নিয়ে আলোচনার কথা বলেন, ফলে প্রসঙ্গটি আবার স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে চাপের মুখে পাড়ে পাকিস্তান নিজেও সম্ভবত কিছুটা বিভ্রান্ত। সেদেশের বিদেশ দপ্তরের অস্থিরতা থেকেই তা বোঝা যায়। ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে বেসরকারি একটি ভারতীয় টিভি চ্যানেলে পাক-প্রেসিডেন্ট মুশারফ বলেছিলেন যে, শর্তসাপেক্ষে কাশ্মীরের ওপর থেকে পাকিস্তান তার দাবি ছেড়ে দিতে রাজি। সেই সুরে তাল মিলিয়ে ১১ ডিসেম্বর পাক-বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র তসনিম আসলাম বিবৃতি দেন, কাশ্মীর তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এমন কথা পাকিস্তান কখনওই বলেনি। অনেকেরই এতে মনে হয়, হয়তো কাশ্মীরের স্বশাসন জাতীয় ব্যবস্থার

স্বার্থে কূটনৈতিক সমঝোতা চাইছে পাকিস্তান। কিন্তু দু'দিন পরেই সুর সম্পূর্ণ বদলে যায় পাকিস্তানের। তসনিম আসলাম বলেন, কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের অধিকার ভারতের চাইতে অনেক বেশি; ভারত সেখানে বেআইনী দখলদার ছাড়া আর কিছুই নয়; পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর শুধু আঞ্চলিক বিবাদ নয়, এটা একটা মর্যাদার প্রশ্ন। এ থেকে ভারতের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমস্যার সমাধান নয়, কাশ্মীরকে কূটনৈতিক দরাদরির স্বার্থে ব্যবহার করাই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় ভারত-পাক কূটনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধরনটি সচিব পর্যায়ের আলোচনা ও তার ব্যর্থতা, সীমিত বাণিজ্যের স্বার্থে ট্রেন ও বাস চালানোর কূটনীতি এবং সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের কাছে তার পরাজয়, ট্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি আর বিভিন্ন দূতাবাস কর্মীকে 'পার্সোনা নন গ্রাটা' বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে বহিষ্কার-এইসব ওঠাপড়ার মধ্যেই আটকে আছে। ব্যাহত হয়েছে ভারত-পাক সম্পর্কে শান্তি ফেরানোর কাজ।

কূটনৈতিক প্রয়াসের বাইরে পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্বের যে ভূমিকা ভারতকে অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় রেখেছে, তা হল পাকিস্তানের অথবা পাক-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মাটিতে কাশ্মীরী জঙ্গিদের ঘাঁটি তৈরি করতে দেওয়া এবং তারা যাতে ভারতের সীমান্তপারের সন্ত্রাস চালাতে পারে সে ব্যাপারে মদত দেওয়া। পাকিস্তান যতই অস্বীকার করুক না কেন, ২০০৬ সালের জুলাই মাসে ভয়াবহ মুম্বাই শহরের বিস্ফোরণ কাণ্ড আর ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের মুম্বাই সন্ত্রাসের পর কাশ্মীর বা করাচি অথবা লাহোর থেকে উদ্ভূত জঙ্গিদের পেছনে পাকিস্তানের মদতের ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এমনকি মার্কিন বিদেশ দফতরের সহকারী সচিব রিচার্ড বাউচার এবং বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইসও এই অভিযোগ মেনে নিয়েছিলেন। একথাও বলা হয়েছে যে, লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উল-দাওয়া এবং জইশ-ই-মুহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে পাকিস্তানের নিত্য-যোগাযোগ আছে। তাছাড়া এদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়দা-র যোগাযোগের আশঙ্কাও অমুলক নয়। অনেকেরই অনুমান, আল-কায়দার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান। ২০০৮ সালের নির্বাচনের সূত্রে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অবসান, পারভেজ মুশারফের পদত্যাগ, নতুন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ গিলানি এবং প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের আগ্রহ দেখে মনে হয়েছিল, হয়তো পাক-ভারত সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। কিন্তু নভেম্বরের মুম্বাই সন্ত্রাস, ভারতের পক্ষে এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে কড়া কূটনৈতিক সতর্কবার্তা 'ডিমার্শ' পাঠানো পুরো প্রক্রিয়াটিকেই থামিয়ে দিয়েছিল।

২০০৮ থেকে ২০২০, এই বারো বছরে সিন্ধু-গঙ্গায় জল বয়ে গেছে অনেক। কিন্তু কাশ্মীরী সন্ত্রাসে মদত দেওয়ায় ভাটা পড়েনি পাকিস্তানের। ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বেড়েছে জঙ্গিযোগ। ২০১৬ সালে ভারতের উরি সেক্টরে, ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় জঙ্গি হানায় প্রাণহানি ঘটেছে ভারতীয় জওয়ানদের। এর যোগ্য জবাব ভারতও দিয়েছে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের' মতো সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে আর সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করে ও জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে। আবার অন্যদিকে পাকিস্তান উল্লসিত হয়েছে ২০২১-এ আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতায় ফিরে আসায়। তবে সম্প্রতি পাকিস্তান বিপাকে পড়েছে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে। পাকিস্তানী সামরিক নেতৃত্ব ও গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই. মনে করছে, ভঙ্গুর পাক-অর্থনীতি জাতীয় নিরাপত্তা অটুট রাখার চাপ সামলাতে পারবে না। তাই আপাতত ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার নীতিতে চলাই শ্রেয়। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া "অতীতকে মাটির তলায় পুঁতে ভারতের সঙ্গে নতুন পথ চলা'র ডাক দিয়েছেন, আর তাজিকিস্তানে 'হার্ট অব্ এশিয়া' সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠকে পাক-বিদেশমন্ত্রী শাহ্ মেহমুদ কুরেশি ভারতের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন।

চাপ এসেছে আমেরিকার দিক থেকেও। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নতুন আফগান নীতি রচনা করেছেন। সেখানে ট্রাম্প সরকারের তুলনায় ভারতকে বেশি জায়গা দেওয়ার কথা দিল্লি এসে বলে গিয়েছেন তার দূত মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন। অতিমারিতে (করোনা-মহামারী) বদলে যাওয়া ভূ-কৌশলগত কূটনীতিতে চিনের 'সর্ব আবহাওয়া মৈত্রী'র

ওপর অতিনির্ভরতা চিন-শত্রু আমেরিকার ক্রোধের কারণ হতে পারে, এই ভয়টাও পাকিস্তানের আছে। তাই হয়তো সেনাপ্রধান বাজওয়াকে বলতে শোনা গেছে, 'পকিস্তানকে শুধু চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের প্রিজম দিয়ে দেখা ঠিক নয়'।

তা সত্ত্বেও কিন্তু ভারতের তরফে স্বস্তিবোধ করার কোনও কারণ নেই। পাক সেনা বা আই.এস.আই. চাইলেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে এখনই আলোচনার টেবিলে বসা কঠিন। বাজওয়ার তত্ত্ব ইমরান সরকার গ্রহণ করছে কিনা, সেটাই একটা বড়ো প্রশ্ন। মৌলবাদী নেতারাও সম্ভবত সেই তত্ত্বে সায় দিতে রাজি নন।

এ ব্যাপারে সবচাইতে বিভ্রান্তিকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও পাকিস্তান সম্পর্কে তার মনোভাব স্ববিরোধী। একদিকে সে সন্ত্রাসের প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে, আবার অন্যদিকে কখনও কখনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারতকে চাপে রাখতে চায়। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-মার্কিন ওয়াশিংটন বৈঠকে এই স্ববিরোধিতার ছাপ স্পষ্ট ছিল। সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে প্রবল ইসলামি প্রতিরোধের মুখে কোনও ধর্মীয় জোট থেকে পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচারকে সরিয়ে রাখার তাগিদেই এই নীতি মার্কিনিদের নিতে হয়েছে। ঘটনার পরিহাসে পাকিস্তানে যারা মৌলবাদী, তারাই এখন সামরিক স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী, গণতন্ত্রী, আর যারা মৌলবাদ-বিরোধী, তারা বাধ্য হয়েছে সামরিক স্বৈরাচারকে সহা করতে। অনেক রক্ত ঝরানোর পর পাকিস্তানে আবার বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এর স্থায়িত্ব কিংবা সেনা-নিরপেক্ষতার ওপর নির্ভর করছে পাক-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অলোক কুমার ঘোষ
প্রণব কুমার চ্যাটার্জি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.অলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০১২, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক,২০১২।

2.প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, হাওড়া: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১|
3.Alastar Lamb, Kashmir: A Disputed Legacy, 1846-1990, Hertingfordbury: Roxford Books, 1991.

4.Mridu Rai, Hindu Rulers Muslim Subjects: : Islam, Rights, and the History of Kashmir, Princeton University Press, 2004.

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

1. Write an essay on Kashmir issue.
2. How did international politics revolve around the Kashmir issue.
3. What is your take on terror attacks in Kashmir?

Block 3

Birth of Bangladesh

Unit 6,7,8

Unit 6: India' role in Liberating the country
Unit 7: Changes in the balance of India's relations with Russia and America
Unit 8: Political and Commercial Relations of India with Bangladesh

উদ্দেশ্য

স্বাধীন বাংলাদেশ: প্রেক্ষাপট ও আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন

অভিপ্রয়াণ সমস্যা (Migration Problem)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান সম্পর্কে

৩. ভারত বাংলাদেশ জলবন্টন সমস্যা সম্পর্কে

৪. ভারত বাংলাদেশ অভিপ্রয়াণ সমস্যা সম্পর্কে

স্বাধীন বাংলাদেশ: প্রেক্ষাপট ও আত্মপ্রকাশ

ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উপজাতীয়তাবাদী তৎপরতা প্রবল হয়ে ওঠে। এই তৎপরতার প্রধানতম তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভাজন ও স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ। আশ্চর্যের কথা, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, আর আড়াই দশকের মধ্যেই সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান বাঙালি জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে বলা চলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের উৎস নিহিত ছিল স্বতন্ত্র বাঙালি জাতিসত্তার মানসিকতায়। মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষাভাষী মুসলিম সমাজের চেতনা ও ঐতিহ্য পশ্চিম পাকিস্তানের অ-বাংলাভাষাভাষী মুসলিম সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। মার্কিন ঐতিহাসিক রিচার্ড ইটন পূর্ব বাংলায় ইসলামীয়করণ প্রক্রিয়াকে এখানকার স্বতন্ত্র ভৌগোলিক ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রফিউদ্দিন আমেদ "The Bengal Muslims" গ্রন্থে বাঙালি মুসলিম সমাজের দ্বৈত-চরিত্রের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় দিক থেকে তাদের ইসলামীয় সত্তা থাকলেও জাতিগত দিক থেকে বাঙালি জাতিসত্তায় অবস্থান। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ব্যতীত পাকিস্তানের দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে ইতিমধ্যেই বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের আন্দোলন রাজনৈতিক স্বাধিকার বিকাশের ইঙ্গিত তুলে ধরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনের দুবছর পরেই আওয়ামী লীগ ও অন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট একুশ-দফা কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। এই একুশ- দফার একটি হল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে মর্যাদাদানের দাবি। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলেও ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৬-এর মে মাসে শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯৬৯ খ্রিপতিদ্ধে গণ-আন্দোলনের

চাপে শেষপর্যন্ত শেখ মুজিবর মুক্তিলাভ করেন। পাকিস্তানের উত্তর খাতে এসে খরে অনুষ্ঠিত করে সামরিক শাসনকর্তা ইয়াইয়া খান নির্বাকতিযোদ্ধে করেন। পাকিস্তানের উনাদের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এই নির্বভান পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী নাখ ১০০টি আসনে জয়যুক্ত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪০টি আসনের মধ্যে কোথাক দিপলস পার্টি ৮১টি আসনে জয়লাভ করে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতা স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নতুন সংবিধান রচনার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ভুট্টো স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিলেন। এই মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াইয়া খান ১৯৭১-এর চুলটা যায়গুলাসেনের বিরোধী অধিবেশন স্থগিত করলেন।

পরিস্থিতি অচিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। সমস্ত পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে শুরু হল প্রতিবাদী আন্দোলন এবং ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ খাতে প্রবাহিত হয়। ইয়াইয়া গানের অনমনীয় মনোভাব ও দমননীতির ফলে মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তখনও তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আলাপ-আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। ২৫শে মার্চ (১৯৭১ খ্রি.) নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানী সামরিকবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণ নেমে এল। এতদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ২৫শে মার্চরে পর পাকিস্তানের সামরিক দমননীতি থেকে উদ্ভুত সাংবিধানিক সংকটের ফলে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা অনিবার্য হয়ে উঠল। শেখ মুজিবর রহমান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিলেন। ১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল প্রবাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হল। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী সরকার শপথ নেয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

বাংলাদেশের আবির্ভাবকে আজও অনেকে ব্যাখ্যা করেন পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ড করার ভারতীয় কূটকৌশলের নিরিখে। দেশভাগ পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষকে ধর্ম-পরিচিতিতে বাঁধতে চেয়েছিল কিন্তু সে বাঁধন মেনে নেয়নি পূর্ব-পাকিস্তানের বাসিন্দারা। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে ১৯৫২ সালে তাদের যে আন্দোলনের সূচনা তাই ১৯৭০-এ পরিণত হয় বাংলদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনে ভারতের মদত ছিল। ভারতের আধিপত্য মেনেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে। কূটনৈতিক ও সামরিক দুদিক থেকে ভারত সাহায্য দিয়েছিল বলেই পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি যে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি করেছিলেন, যার স্বীকৃতি ছিল ১৯৭২ সালের ৩ জুলাইয়ের ইন্দিরা-ভুট্টো পাক-ভারত সিমলা চুক্তিতে, সেই চুক্তিতে ভারতের প্রভাব বাংলাদেশ পরোক্ষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সেই সুযোগে ভারতীয় বাণিজ্যমহল-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বাংলাদেশের ক্ষমতা পাওয়া নবাধনিক গোষ্ঠী সেই গরিব দেশে যে নগ্ন লণ্ঠন শুরু করে, তার ধাক্কায় ৩৬৩ কোটি অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়, আর তায় দায় এসে পড়ে ভারতের ঘাড়ে। এর একদিকে ভারতবিরোধী মৌলবাদ ঘনিষ্ঠ শেখ মুজিবর রহমান দ্রুত জনপ্রিয়তা হারান, আর সেই সুযোগ মার্কিন মদতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মুজিব বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে ১৯৭৫ সালের আগস্টে, সপরিবারে নিহত হন শেখ মুজিব। সেই থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রধানত সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় আর ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়েও একটি প্রতিরোধক শক্তিতে পরিণত হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি।

Unit 7: Changes in the balance of India's relations with Russia and America

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:

১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের পর প্রায় এককোটি শরণার্থী ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। এর ফলে ভারত সরকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুদিক থেকেই প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন হল। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-এশিয়ার সংকট এক আন্তর্জাতিক সংকটে পরিণত হল। ভারত-পাকিস্তান দ্বি-পাক্ষিক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি নমনীয় পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে কুটনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সংকটের সময় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে মার্কিন সংবাদপত্রগুলি কঠোর সমালোচনা করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয় নিবন্ধে "An internal matter?" শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-অনুসৃত ভ্রান্ত ও অদূরদর্শী নীতিতে সমালোচনা দেখা যায় এবং পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানে জনগণের ওপর নির্মম অত্যাচারকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। টাইমস পত্রিকায় নিকসন প্রশাসন কর্তৃক পাকিস্তানকে সমরাস্ত্রদান নীতির বিরোধিতা করা হয়। ৬ই আগস্ট ১৯৭১ 'Stability in Pakistan" নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল ইসলামাবাদের জঙ্গী নীতি পূর্ব বাংলায় স্থায়িত্ব আনতে পারবে না এবং নির্মম অত্যাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এরপর ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারতের সামরিক সমাবেশের সমালোচনা করা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রহস্যময় নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকায় একই সুরে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ ও মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে দক্ষিণ এশীয়

কূটনীতিতে প্রভাব স্থাপনের সুযোগ এনে দিয়েছে। ঐ পত্রিকার অভিমত হল (৭ই ডিসেম্বর সম্পাদকীয়) ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুত্ব রক্ষার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি এতটা জটিল হয় না। এর মূলে কি মস্কো-বেজিং-ওয়াশিংটন ত্রিভুজ-এর রাজনৈতিক জ্যামিতি নিহিত রয়েছে (If the answer lies somewhere in the political geometry of the Moscow-Beijing-Washington triangle, we fail to perceive it.)

শুধুমাত্র মার্কিন সংবাদপত্রগুলিই নয়, ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার প্রতিবেদক জ্যাক আন্ডারসন তাঁর "The Anderson Papers' গ্রন্থে রাষ্ট্রপতি নিকসন ও তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা হেনরি কিসিংগার খার পাকিস্তানপন্থী নীতির ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। মার্কিন নীতির ব্যর্থতার চারটি দিক উল্লেখ করা যায়-(১) এর ফলে পূর্ব এশীয় সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি। (২) সোভিয়েত-ভারত, চীন-পাকিস্তান কূটনৈতিক ব্যুহ গঠনে সহায়ক হয়েছে।

(৩) পাকিস্তানের মতো একটি কঠোর নির্মম রাষ্ট্রের সহযোগী হয়ে অনৈতিকতার পরিচয় দিয়েছে। (৪) উপ-মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শিথিল হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দিকে সংযত মনোভাব গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পোডগনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াইয়া খানকে লিখিতপত্রে (৩ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানে রক্তক্ষয়ী দমননীতি বন্ধ করার পরামর্শ দিলেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভিমত ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে প্রয়াসী হয়। এর মূলে দুটি কারণ দেখা যায়। প্রথমত, ভারত বুঝতে পেরেছিল ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এ দুটিই ভারতের সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এরজন্য প্রয়োজন সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতা। দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়। তাই ভারতের আশঙ্কা ছিল চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণ করলে পরিস্থিতি ভারতের প্রতিকূল হয়ে উঠবে। এই পরিস্থিতিতে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ই আগস্ট ভারত-সোভিয়েত মিত্রতা চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তির ফলে নিরাপত্তার প্রশ্নে অনেকটা আশ্বস্ত হল। এরপর সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গেলেন। পূর্ব- পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুমোদন পাবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯৭১ এর আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আটটি জাহাজে প্রচুর সমরাস্ত্র রাশিয়া থেকে ভারতে আসে। এরপর নভেম্বরের শেষে ইন্দিরা গান্ধি ঘোষণা করলেন বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ৩রা ডিসেম্বর ভারত পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে। প্রায় ৯০,০০০ পাক-সেনাকে বন্দী করা হয়। ইতিমধ্যে ৫ই ডিসেম্বর চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবগুলিতে যুদ্ধবিরতি ও অন্যের ভূখণ্ড থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেওয়ার জন্য ঐ প্রস্তাব দুটি অনুমোদিত হয়নি। এর ফলে ভারত বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পেল। শেষপর্যন্ত, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাকিস্তানী সেনা আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করল।

স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর ভারত বাংলাদেশ-এর সঙ্গে মিত্রতাচুক্তিতে আবদ্ধ হয়, অন্যদিকে পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি জুলফিকর আলি ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। এর পরিণতি হল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই সম্পাদিত সিমলা চুক্তি। এই চুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা চিহ্নিত করা হয়।

Unit 8: Political and Commercial Relations of India with Bangladesh

ভারতের অভিভাবকত্বের নেশাই বাংলাদেশেও প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছে। অথচ বহু ব্যাপারেই ভারতের ওপর বাংলাদেশকে নির্ভর করতে হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারত নয়, বাংলাদেশই এই উপমহাদেশের সমস্যা তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রধানত তিনটি বিষয়ে মন-কষাকষির জায়গা আছে। এক, ছিটমহল সংক্রান্ত সীমানা সমস্যা ও সেই সূত্রে চোরাচালানের বাড়বাড়ন্ত। দুই, বাংলাদেশ থেকে ভারতে গণ-অনুপ্রবেশ, যার মধ্যে আছে মৌলবাদী বাংলাদেশের তাড়ায় ত্রিপুরায় চলে আসা চাকমা বৌদ্ধরা, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা হিন্দুরা এবং দারিদ্রদ্র্যপীড়িত কর্মপ্রার্থী মুসলমানরা। তৃতীয় বিষয়টি হল, তিস্তা ও গঙ্গানদীর জলবন্টন। চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি বাংলাদেশ যাতে স্বীকার করে সেজন্য বরাবরই ভারতকে যথেষ্ট কূটনৈতিক প্রয়াস চালাতে হয়। চোরাচালানকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীদের গুলিচালনাও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাংলাদেশে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি গাড়ার বিষয়টি।

১৯৯১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছ'মাসেই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ৩৯,০৫৫ জন বাংলাদেশি ধরা পড়েছিল। এরপর আর এটা স্বীকার না করে বাংলাদেশের উপায় ছিল না। ১৯৯৪-৯৫ সালে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি হয়, অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তন নিয়ে তারা আলোচনা শুরু করে। তবে এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে ভারতের 'পুশব্যাক' নীতিই অনেক বেশি কার্যকর বলে মনে করা হয়।

ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধানতম জটিল সমস্যাটি হল জলবন্টন সমস্যা। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গেই এই সমস্যার সূত্রপাত হয়। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ভাগীরথী- কালী নদীতে ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প গৃহীত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখর হয়। প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফারাক্কা প্রকল্প কার্যকর হয় এবং ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীতে আসায় নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং যৌথ নদী-কমিশন গঠিত হয়। অনেক দরকষাকষির পর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পাঁচ বৎসর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হল জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রতিটি মাসকে ১০ দিন করে তিন ভাগে বিভক্ত করে জলবন্টনের সুত্র স্থির করা হল। এই সূত্র অনুসারে ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে সর্বোচ্চ ৪০,০০০ কিউসেক থেকে সর্বনিম্ন ২০,৫০০ কিউসেক জল নিতে পারবে, আর বাংলাদেশ

৫৮,৫০০ কিউসেক থেকে সর্বনিম্ন ৩৪,৫০০ কিউসেক জল পাবে। চুক্তি সত্ত্বেও জলবন্টন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হল না। গঙ্গার জলের পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি করা হবে সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারত প্রস্তাব দেয় ব্রহ্মপুত্রের উপর একটি ব্যারেজ তৈরি করে গঙ্গা-

ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে একটি সংযোগকারী খাল খনন করা হোক। অন্যদিকে বাংলাদেশ পাল্টা প্রস্তাব দিল-কলকাতা বন্দর ও বাংলাদেশ উভয়ের স্বার্থেই নেপালে জালাধার নির্মাণ করে অতিরিক্ত জল সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। এরপর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর সঙ্গে দেখা করে এবং সময়সীমা বেঁধে একটি স্থায়ী ও সুসংহত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে দুপক্ষ সহমত ব্যক্ত করেন। পরিশেষে

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিশবর্ষ মেয়াদী একটি জলবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই চুক্তিটিকে পারস্পরিক বিদ্বেষপূর্ণ যুগের অবসান ও "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নব অধ্যায়ের সূচনা" বলে অভিহিত করেন। চুক্তিটির মূল শর্তগুলি হল-

(১) ফারাক্কা বাঁধে ৭০,০০০ কিউসেক জলপাওয়া গেলে দুটি দেশ ৩৫,০০০ কিউসেক পরিমাণ জল পাবে। (২) ফারাক্কায় জলের পরিমাণ ৭৫,০০০ কিউসেক বা তার বেশি হলে ভারত ৪০,০০০ কিউসেক ও বাকী অংশ বাংলাদেশ পাবে।

(৩) তবে ১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত দশদিন বাদে বাদে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই পর্যায়ক্রমে অন্ততপক্ষে ৩৫,০০০ কিউসেক জল পাবে।

এই চুক্তিতে জলবন্টন ব্যতীত চাকমা শরণার্থীদের বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন ও দুই দেশের মধ্যে সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি বিষয় নিয়েও ভাব-বিনিময় হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই চুক্তিটিকে সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বড়োই অল্পদিন স্থায়ী হয়েছিল এই পর্বটি। হাসিনার বিরোধী দলের ক্ষমতাপ্রাপ্তি এবং শেষপর্যন্ত একটি নিরপেক্ষ সরকারের বকলমে সেনাশাসন ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের মনোভাবকে পাল্টে দেয়। শেখ হাসিনারও সেসময়ে মনে হয়েছিল, ২০০৯-এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার সেনা-নিয়ন্ত্রিত সরকারকেই সমর্থন দিয়েছিল এই আশায় যে, বাংলাদেশের তেল গ্যাসের ভাণ্ডার ভারতের জন্য খুলে দেওয়া হবে। তা তো হয়ইনি, বরং বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাতের মতো মৌলবাদী দলের দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়ে গিয়েছিল জঙ্গি-কার্যকলাপ, বেড়েছিল বিস্ফোরকের আনা-নেওয়া।

২০০৮ সালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। তারপর থেকেই ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা শুরু হয় আবার। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'জিরো টলারেন্স' নীতি ভারত সরকারকে খুশি করে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরে যান। স্থলসীমান্ত চুক্তি করে ছিটমহল সমস্যা মেটানো হয়। জঙ্গি ও মাদক চালানকারীদের নজরদারি ও তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় দুই দেশ। বিপুল পরিমাণ ভারতীয় বিদ্যুৎ পাঠানো শুরু হয় বাংলাদেশে-২০২১ সালে বাংলাদেশের বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবে সেখানে প্রধান রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যান ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ওঠাপড়া তবু থেকেই যায়। প্রতিশ্রুত তিস্তার জলবন্টন চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি এখনও। করোনা প্রতিষেধক রপ্তানির চুক্তি করেও সেই চুক্তির শর্ত মানা সম্ভব হয়নি ভারতের পক্ষে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিতাড়নের চেষ্টা ও মাঝেমধ্যে ঘটে যাওয়া দাঙ্গাও বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয় মানসিকতাকে কঠোর করে তোলে।

আসলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে দুটো বড়ো সমস্যা বরাবর থেকে গেছে। প্রথমত, ভারতের হাতে জন্ম নেওয়া একটি ছোটো দেশ ভারতের আধিপত্য সম্পূর্ণ মেনে নেয় না, এই ভাবনাটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে একধরনের ইগো সমস্যা তৈরি করে, যার চাপ থেকে যায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের ওপর। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মৌলবাদী সমরতন্ত্রী সমাজ বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে এবং আন্তর্জাতিক ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীর সাহায্য নিশ্চিত করে জঙ্গি ভারত-বিরোধিতার রাজনীতি নিয়ে। ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা স্তরে আদানপ্রদান সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট সীমানায় বন্দি হয়ে থাকে।

অভিপ্রয়াণ সমস্যা (Migration Problem):

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হল অভিপ্রয়াণ সমস্যা ও গঙ্গা জলবন্টন বিরোধ।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপন্নবোধ করে। পাকিস্তান একটি ইসলামীয় রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হওয়ায় অ-মুসলিম সম্প্রদায় দলে দলে পাকিস্তান ত্যাগ করে শরণার্থী হিসেবে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। যদিও ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি অনুসারে এই সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কোন গুণগত পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। এরপর পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন সংখ্যালঘু স্বার্থ-বিরোধী আইন বলবৎ করে এবং সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চে পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এককোটি শরণার্থী পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে। এর মধ্যে শতকরা আশিভাগ ছিল হিন্দু সংখ্যালঘু মানুষ।

স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করলেও সে দেশের ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সুদৃঢ় হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারী প্রবণতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমানতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং বাংলাদেশ সামরিক শাসনের কুক্ষিগত হয় (১৯৭৫ খ্রি.)। এরপর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে নথিভুক্ত করেন। এরফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা পেল।

বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিপ্রয়াণের ফলে সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের হার ক্রমিক হ্রাস পায়। আদমসুমারীর হিসেব থেকে দেখা যায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদের আনুপাতিক হার ছিল শতকরা ২৮ ভাগ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তা হল ১৮.৫ ভাগ, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৩.৫ ভাগ, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ১২.১ ভাগ। বস্তুতপক্ষে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১.২২ মিলিয়ন হিন্দু বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসে। শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হিন্দুরা নয়, মুসলমান জনগোষ্ঠী, ভারতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে।

পশ্চিমবাংলা ও আসামের সমাজ ও অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি, পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যার সম্প্রদায়গত ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। আসামের পরিস্থিতি আরও জটিল ও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। আসামে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর আগমনে একদিকে অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যার আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আসামের অগ্রগণ্য চিন্তাবিদ ও ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক এইচ. কে. বরপূজারি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের মূল সভাপতির ভাষণে (North-East India The Problems and Policies since 1947) দেখিয়েছেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সময় থেকে ভারত সরকার অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে কোন সুষ্ঠু কার্যকর নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। এরপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পরবর্তী কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীগণ আসামে কংগ্রেস শাসন বহাল রাখার জন্য সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় আসামে বিদেশী বিতাড়নের প্রশ্নে A.A.S.U. ও মণিপুর স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থা বিদেশী বিতাড়নের প্রশ্নে আন্দোলনের পথে ধাবিত হয়। অভিপ্রয়াণ সমস্যার সঙ্গে চাকমা জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। চট্টগ্রাম পার্বত্য

অঞ্চলে (C.H.T.) চাকমা উপজাতির জনগণের ওপর বাংলাদেশ সরকার বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে এবং চাকমা উপজাতিদের অবদমিত করার জন্য নির্মম অত্যাচার চালায়। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে অন্যান্য স্থান থেকে মুসলমান সম্প্রদায় বসতি স্থাপন শুরু করে এবং চাকমাদের জীবন-জীবিকার সংশয় দেখা দেয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদের শাসনকালে সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় চাকমা সম্প্রদায় জন সংহতি সমিতি (J.S.S) গঠন করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে এই সমিতি পাঁচ দফা দাবি পেশ করে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রমিক অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে। ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার চাকমা শরণার্থী অত্যাচারের হাত থেকে নিভৃতি পাওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার চাকমা শরণার্থীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু চাকমারা প্রত্যাবর্তনে রাজী হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চাকমারা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চায়, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ঐ দাবি অগ্রাহ্য করেন। এদিকে বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার জন্য জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে চেষ্টা করে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনকালে পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। ১৯৯৩-এর নভেম্বরে নানিয়াচর হত্যাকাণ্ডে ২৭ জন চাকমা নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিরোধী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল সফর করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান। ইতিমধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐকাপরিষদ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য দাবি জানায় এবং ভারতে চাকমা শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাকমা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় এসেছেন এবং সমস্যার আশাব্যঞ্জক সমাধান সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে থেকে অভিপ্রয়াণ সমস্যার সমাধানের মূলে তিনটি বিকল্প পথ রয়েছে। প্রথমটি হল ভারত থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিতাড়ন এবং সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা বিধান করা। দ্বিতীয়ত, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির শর্তানুসারে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশের কিছুটা অঞ্চল নির্দিষ্ট করতে হবে। তৃতীয়ত, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশে এক স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়া প্রয়োজন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীদলের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ফলে (ডিসেম্বর ২০০৮) ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক। আনন্দের কথা, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিস্থিতি অনেক উৎসাহব্যঞ্জক। ইতিপূর্বে জিয়ায়ুর রহমান ও জি. এ. এরশাদের সময় বাংলাদেশ সামরিক শাসনের অধীনে থাকে। সেসময় বাংলাদেশে সমরবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীশ্রেণি এক জনবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলবৎ করে। এর ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমাজ (civil society)-এর ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। আশা করা যায় রাষ্ট্র ও জনসমাজের ব্যবধান দূর হলে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ সুনিশ্চিত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অলোক কুমার ঘোষ
প্রণব কুমার চ্যাটার্জি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.অলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০১২, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক,২০১২।

2.প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, হাওড়া: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১|
3.Ushinor Majumdar, India's Secret War and Nine Months to the Birth of Bangladesh, Penguin Random House India Private Limited, 2023
4.Jaswant Singh, Conflict and Diplomacy: US and the Birth of Bangladesh, Pakistan Divides, Rupa & Company, 2008

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. Discuss how India has helped in the liberation of Bangladesh
2. Write a critical note on India-Bangladesh relationship.

Block 4
India and the Third World

Unit 9, 10, 11

Unit 9: Policy towards South\ South-east Asian Countries
Unit 10: The NAM, SAARC, and the ASEAN relations with Sri Lanka
Unit 11: Relations with Myanmar and the Rohingya issue

উদ্দেশ্য

সূচনা

ভারত এবং নেপালের সম্পর্ক

ভারত এবং ভুটান সম্পর্ক

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়া

জোট-নিরপেক্ষতা

তৃতীয় বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠন

আসিয়ান (ASEAN)

সার্ক (SAARC)

ভারত এবং শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক

মায়ানমার এবং ভারত সম্পর্ক

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. ভারত এবং নেপালের সম্পর্ক

২. ভারত এবং ভুটান সম্পর্ক

৩. জোট-নিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে

৪. তৃতীয় বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠন সম্পর্কে

৫. মায়ানমার এবং ভারত সম্পর্ক বিষয়ে

Unit 9: Policy towards South\ South-east Asian Countries

সূচনা

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ ঐতিহ্য সন্দেহাতীত। গৌতম বুদ্ধ ও মহান অশোকের শান্তি ও সম্প্রীতির আদর্শ বহির্ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তৃতীয়ত, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজি ও জওহরলাল নেহরুর নীতি ও নেতৃত্ব সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গান্ধীজি ছিলেন সত্য ও অহিংসার প্রতিমূর্তি। বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের তিনি ছিলেন অক্লান্ত সেনানায়ক।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর সমস্ত জীবন ধরে এক ত্রিমুখী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন- এই তিন ধরনের সংগ্রাম ছিল একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও হিংসার বিরুদ্ধে গান্ধীজি শেষপর্যন্ত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে অহিংস গণ -আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং এরপর ভারতে ফিরে এসে জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধাররূপে অহিংস পদ্ধতিতে ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলা মোচনে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলন সংগঠিত করেন। কিন্তু শুধু জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গান্ধীজি অহিংস শান্তিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বেলগাঁও-এ জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গান্ধিজি বলেছিলেন, "the better mind of the world desires today not absolutely independent states, warring against one another, but a federation of friendly inter-dependent states." অন্যদিকে জওহরলাল ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিষয়ক ধ্যান-ধারণার মুখ্য প্রবক্তা। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের বৃহত্তর ধারার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নটিকে তিনি সম্পৃক্ত করেছিলেন। নেহরুর মতে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অভিন্ন উৎসজাত এবং বিশ্বের বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। স্বাধীনতা ও শান্তি অবিভাজ্য ও পরস্পরের পরিপূরক ('Freedom, like peace, was indivisible- গোপাল, জওহরলাল নেহরু,

প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩২)। নেহরু নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, 'the frontiers of our struggle lie not only in our own country, but in Spain and China also." নেহরু উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান না হলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা অলীক কল্পনা মাত্র।

ত্রিশের দশকে চীনে জাপানি আগ্রাসন, আবিসিনিয়ায় ইটালির অভিযান ও পূর্ব ইউরোপে জার্মান সম্প্রসারণকে তীব্র সমালোচনা করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় জওহরলাল স্বয়ং স্পেনে গিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির জটিলতার জন্য ভারত পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোনরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না; কেননা সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত ভারতের আশু বিচার্য বিষয় ছিল অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থায়িত্ব, এছাড়া ভারতের আর্থিক উন্নয়নসাধন জরুরী হয়ে পড়েছিল। দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বৈদেশিক সহায়তা আবশ্যিক ছিল, কারণ ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর দেশের পক্ষে শিল্পায়নের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ সম্ভব ছিল না। স্বাধীন ভারত মিশ্র অর্থনীতির (Mixed economy) বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ঋণ ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল প্রয়োজন, স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় শিবিরের দেশগুলি থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে অপর একটি বিশিষ্ট উপাদান হল রাজনৈতিক মতবাদ। ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজতন্ত্রবাদ অথবা পুঁজিবাদ এ দুইয়ের কোন বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করেনি। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির উন্মেষ ঘটে এবং সমগ্র বিশ্ব দুটি পরস্পর বিবদমান শক্তিশিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দ্বি-মেরুকরণ রাজনীতিতে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এছাড়া বিশ্বরাজনীতিতে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটি বিকল্প তৃতীয় কূটনৈতিক বলয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নীতি নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল । প্রথমত, জাতীয় রাজনীতির ভারসাম্য একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে সহায়ক হয়েছিল। যদিও ভারতবর্ষে জাতিগত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বিভেদকামী শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী এক-দশকে ভারত অভূতপূর্ব রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক সুস্থিতির পরিচয় দেয়। অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্বের সুবাদে ভারতের পক্ষে বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক স্তরে ভারতবর্ষ তেমন কোন অস্থিরতা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশগুলিই স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রতিবেশী সাম্যবাদী রাষ্ট্র চীনের সঙ্গেও ভারতের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, বিশ্বরাজনীতিতে ঠান্ডা লড়াই থেকে উদ্ভুত সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। পূর্বতন ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে উদ্ভুত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে গভীর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান পাশ্চাত্য শিবিরের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল। তাই ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা ভারতের প্রধান ইতিকর্তব্যে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী একদশক ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে "সোনালী সময়" (the golden age of India's foreign policy) নামে অভিহিত। এ সময় ভারতবর্ষ বিশ্বরাজনীতিতে অভাবনীয় মর্যাদা লাভ করে এবং এক বিকল্প শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি রচিত হয়। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধানতম দিক হল গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা (Non-alignment) অধ্যাপক ভি. পি. দত্ত গোষ্ঠী-

নিরপেক্ষতাকে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মৌল কাঠামো বলে অভিহিত করেছেন। Non-alignment became the logical framework of India's foreign policy)

রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান বা চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তার আন্তর্জাতিক বীক্ষণের অংশ। কিন্তু চিনের পাশাপাশি ভারতও যখন এশিয়ার রাজনীতিতে আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে ক্ষমতা অর্জন করতে চয়ে, তখন তাকে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের কূটনীতি বলা ভালো। এই কূটনীতির আওতায় আসে নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশে ও পাকিস্তান-এইসব দেশ। এর মধ্যে ভুটান ও মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেকটা গ্রহীতা ও দাতার সম্পর্ক, নেপাল, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রতিরোধক ও আধিপত্যবিলাসীর সম্পর্ক, আর অঞ্চল প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে হল নিয়ন্ত্রণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক।

ভারত এবং নেপালের সম্পর্ক :

চিন ও ভারতের মধ্যবর্তী দেশ হওয়ায় ভারতের কাছে নেপালের একটি ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বরাবরই ছিল। ভারতের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক সূত্রে নেপালকে বেঁধে রেখে চিনের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা। অর্থনৈতিক কারণেই নানা সামন্ত রাজ্য ও পাহাড়ি জনজাতিতে বিভক্ত নেপালের রাজনৈতিক ঐক্য ভারতের কাম্য ছিল। কেন্দ্রে একজন রাজা থাকা সত্ত্বেও, ১৯৪০-এর দশকে নেপালে আসল ক্ষমতা ছিল প্রধানমন্ত্রী বা 'রাণা'র হাতে, কিন্তু রানা রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠতে পারেননি, ভারতের তেমন বিশ্বাসভাজনও তিনি ছিলেন না। গণতন্ত্রী দেশ হিসেবে ভারত নেপালেও গণতন্ত্র চাইতে পারত, কিন্তু সেক্ষেত্রে চিনের প্রভাব নেপালে কতটা পড়তে পারে তাই নিয়ে ভাবিত ছিল সে। সেক্ষেত্রে রাজতন্ত্রই ছিল মন্দের ভালো, তাই ১৯৪৭ সালের পর জওহরলাল নেহরু নেপালের রাজা ত্রিভুবনকে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা সংহত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জুলাই ভারত ও নেপালের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি রক্ষার পাশাপাশি উভয় দেশে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে পারস্পরিক সাহাযের অঙ্গীকার করা হয়। দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেপাল বাণিজ্যিক কারণে ভারতের বন্দর ব্যবহার করার সুযোগ পায় । যদিও আপাতদৃষ্টিতে চুক্তিটিকে সামরিক চুক্তি বলা চলে না। কিন্তু নেপালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার প্রভাব ভারতের উপর পড়বে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১ মার্চ ১৯৫০ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত পত্রে জানিয়েছিলেন নেপাল আক্রান্ত হলে আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। তাঁর মতে নেপালের নিরাপত্তা আর ভারতের নিরাপত্তা একে অন্যের পরিপূরক।

শীঘ্রই নেপাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দাবিতে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। যদিও ভারত নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বিরোধী ছিল, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কারের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানালেও ভারত প্রভাবশালী রানা শাসকগোষ্ঠীর জন-বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে। নেপালের রাজা ত্রিভুবন পরিস্থিতি বেসামাল দেখে ভারতে চলে আসেন (নভেম্বর, ১৯৫০) শেষপর্যন্ত ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে নেপাল কংগ্রেসের নেতা এম দি কৈরালার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় বসে এবং রানা গোষ্ঠীর প্রভাব খর্ব হয়।

নেপালের উপর ভারত-এর সহাবস্থানমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পাশাপাশি চীন তিব্বতের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। নেপাল তিব্বতের বেশকিছু সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ভারত-চীন চুক্তির মাধ্যমে তিব্বতে

চীনের প্রাধান্য মেনে নেয়। বিনিময়ে সিকিম, ভুটান ও নেপাল-এর উপর ভারতের বিশেষ স্বার্থকে স্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নেপালের বৈদেশিক নীতির উপর ভারতের পরোক্ষ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতের প্রতিপত্তি নেপাল-এর পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হল। রাজপদে মহেন্দ্র অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত-নেপাল সম্পর্কে কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়। নেপালের প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে চীন সফরে যান এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালে আসেন। চৌ নেপালের সঙ্গে চীনের 'রক্তের সম্পর্ক' (blood brothers)-এর কথা উল্লেখ করেন।

১৯৫০ থেকে ১৯৮০-এই সময়পর্বে ভারত-নেপাল সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি ছিল ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি। ১৯৫০ সালের ৩১ জুলাই নেপালের প্রধানমন্ত্রী মোহন শমসের জং বাহাদুর রাণা এবং নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত চন্দ্রেশ্বর নারায়ণ সিং এই চুক্তিতে সই করেছিলেন। চুক্তির নাম ছিল 'Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship'। চুক্তিটির দুটো প্রধান শর্ত ছিল। একটি হল, দুটো দেশেরই সীমান্ত মানুষ ও পণ্যের জন্য খোলা থাকবে আর দু'দেশেই দু'দেশের মানুষ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। দ্বিতীয় শর্তটি হল, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দুটো দেশ খোলাখুলি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে, ভারত নেপালের জাতীয় প্রতিরক্ষায় সাহায্য করবে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ব নেবে।

নেপালের সব মানুষ যে এই চুক্তিতে খুশি হয়েছিল তা নয়। সমালোচকরা একে ভারতের কাছে নেপালের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়ার চুক্তি বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু তবুও নেপাল ভারতের প্রতি তার নির্ভরতার নীতি থেকে সরে যায়নি। ১৯৬০ সালের মধ্যেই সে ভারতের সঙ্গে আরও তিনটি চুক্তি করে: কোসি নদী চুক্তি (Kosi River-Agreement-1954), গণ্ডক নদী চুক্তি (Gandak River Agreement-1959) এবং বাণিজ্য ও চলাচল চুক্তি (Trade and Transit Treaty-1960)।

১৯৮০'-র দশকে নেপালের সুর কিছুটা পাল্টায়। যতদিন চিনে মাও জে দং-এর পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর ছিল, ততদিন চিন, নেপাল কোন্ দিকে ঝুঁকে আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু মাও-পরবর্তী জমানায় চিন এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সতর্ক হয় এবং নেপালের আর্থ-রাজনীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়। এই সময়ে নেপাল চিনের প্রতি বাণিজ্যিক পক্ষপাতিত্বের নীতি গ্রহণ করে, চিনের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে থাকে, অন্যদিকে নেপালবাসী ভারতীয়দের ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত ক্ষুণ্ণ হয় এবং ১৯৮৯ সালে ভারত থেকে নেপালে পণ্য চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়। এতে নেপাল সরকার ভারতের প্রতি নমনীয় হতে বাধ্য হয়। এই সময়ে ভারতের সমর্থন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দিকে চলে যায়। নেপালেও ইতিমধ্যে রাজবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ফলে ১৯৯১ সালে রাজা বীরেন্দ্র বহুদলীয় গণতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য হন। এই সময়ে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আবার ভালো হয়ে যায়। রক্সোল সীমান্তে ভারত-নেপাল বাণিজ্যের প্রধান সেতু 'সিরসিয়া' সম্পূর্ণ হয়, ভারতের মদতে গড়ে ওঠা রাজবিরাজ শিল্পতালুক তুলে দেওয়া হয় নেপালের হাতে। ১৯৯৪ সালের আগস্টে নেপালরাজ ভারত সফর করেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে নেপালে ভারতেন রপ্তানি পৌঁছয় ৭,৮৭৪.৬৩ মিলিয়ন টাকার মূল্যে। সম্পাদিত হয় ১৯৯৬ সালের মহাকালী চুক্তি (Mahakali Treaty)। জলবিদুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত সাহায্যের আশ্বাস দেয়। ত্বরান্বিত হয় পদ্মেশ্বর নদী-প্রকল্পের কাজ।

ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়ে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আবার জটিল হয়ে ওঠে ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে। গণতন্ত্রের সঙ্গে আপস করা রাজা বীরেন্দ্রকে সপরিবারে হত্যা করা হয় ২০০১ সালের ১ জুন। নেপালে স্বৈর-রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন নতুন রাজা জ্ঞানেন্দ্র, তার অত্যাচারে নতুন করে আন্দোলনের জন্য তৈরি হয় নেপালি সমাজ। এই সুযোগে সেখানে দ্রুত

প্রভাব বিস্তার করে মাওপন্থী বামদল। এতে আতঙ্কিত হয় 'গণতন্ত্রী' ভারত, প্রথমদিকে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর সঙ্গে অসহযোগিতা করলেও ধীরে ধীরে ভারত আবার যোগাযোগ রাখতে থাকে। শেষপর্যন্ত ২০০৬ সালের জুলাই মাসে উদার গণতন্ত্রী ও মাওবাদী দলের যুক্ত প্রতিরোধের কাছে হার মানতে হয় রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে, তার রাজকীয় ক্ষমতা ছাঁটাই করে দেওয়া হয়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতায় এবার ভারত নেপালের গণতন্ত্রকে স্বাগত জানায় এবং আরও অর্থনৈতিক সহযোগিতার আশ্বায় দেয়।

২০০৮ সালের এপ্রিলে নেপালের সংসদীয় নির্বাচনে মাওপন্থী বামদল ভালো ফল ক'রে নেপালের রাষ্ট্রক্ষমতার স্বাদ পায়। অবসান ঘটে রাজতন্ত্রের। বিপুল ক্ষমতা পান মাওপন্থী নেতা পুষ্পকমল দহল ওরফে 'প্রচণ্ড'। নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তিনি ভারত সফরে আসেন। তিনি ভারত-নেপাল চুক্তিকে ফিরে দেখতে চান বটে, কিন্তু তাতে ভারত-নেপাল সম্পর্ক খারাপ হয়নি। বরং নদী নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত-নেপাল বোঝাপড়া আরও পোক্ত হয়েছে।

তবে ভারত-নেপাল সম্পর্কে অম্লভাব যে কখনও দেখা দেয়নি তা নয়। নেপালের সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগে ভারতের সায় ছিল না, এতে খুশি হয়নি নেপাল। ২০১৪ সালে তখনকার বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নেপাল সফরে গিয়েছিলেন, তার পরপরই যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির 'HIT' ফর্মুলা, হাইওয়ে, ইনফোওয়ে, ট্রান্সমিশন, নেপালে সাড়াও ফেলে, কিন্তু সমস্য তৈরি হয় ২০১৫ সালে নেপালের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর, যার বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী প্রবণতায় ভারতের অস্বস্তি ছিল, তাই সেই সংবিধানের কিছু সংশোধনের ব্যাপারে চাপও ছিল ভারতের দিক থেকে। অবস্থার অবনতি ঘটে ২০১৯ সালে ভারতের সংবিধান থেকে জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ নম্বর ধারা বিলোপের পর। বিতর্কিত এই সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষমতার একক প্রয়োগ চিন বা নেপাল কেউই ভালো চোখে দেখেনি। ২০২০-র মে মাসে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলায় সীমান্তবর্তী লিপুলেখ পর্যন্ত আশি কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক উদ্বোধন করেন। এতে নেপালের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। নেপাল পাল্টা পদক্ষেপে বলতে শুরু করে যে মহাকালী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে হিমালয় ঘেরা ভারত-নেপাল সীমান্তের পুনর্নির্ধারণ প্রয়োজন, কেননা ১৮১৬-র ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের শেষে করা সুগৌলি চুক্তিতে লিমপিয়াধুরা থেকে উৎসারিত মহাকালী নদীকেই সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয় ২০২০-র মাঝামাঝি সময়ে যখন নেপালি প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি সেদেশের পার্লামেন্টে নেপালের নতুন মানচিত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করতে উদ্যোগী হন। সেই মানচিত্রে ভারতের লিপুলেখ গিরিপথ, লিমপিয়াধুরা ও কালাপানিকে নেপালের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। প্রধানমন্ত্রী অলি মন্তব্য করেন "Indian virus is more lethal than Chinese virus"। তবে তীব্র আপত্তি জানিয়েও ভারত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ খোলা রেখেছে। এখন উদ্যোগী হয়েছেন নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা-ও। চিনের চাপ অগ্রাহ্য করে নেপাল যদি 'সুপ্রতিবেশী'র নীতি নিয়ে চলতে পারে, তাহলে ভারত-নেপাল সম্পর্কের মাধুর্য হয়তো ফিরে আসবে আবার।

ভারত এবং ভুটান সম্পর্ক:

পাহাড় ঘেরা ছোট্টো সামন্ত সীমান্ত-রাষ্ট্র রাজতান্ত্রিক ভুটানকে নিয়ে এতদিন ভারতের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ভারতের বিদেশ নীতিতে ভুটানও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার কারণ চিন, তার কারণ নেপাল। ১৯৪৯ সালের ভারত-ভুটান চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভুটান ভারতের উপদেশ মেনে চলবে, ভুটানের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে ভারত। কিন্তু চিন ও নেপালের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই ভুটান যথার্থ সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। ১৯৭১-এ ভুটান রাষ্ট্রপুঞ্জে তার মিশন

খোলে। ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন ও তার দূত হেনরি কিসিঞ্জার চিন সফর করে চিন-ভুটান উভয়ের মাথাতেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে নতুন ভাবনা ঢুকিয়ে দেন। আর ১৯৭৯-তে ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক ঘোষণা করেন, সার্বভৌম ভুটানের চিনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৮৪-তে সত্যি সত্যিই ভুটানের প্রতিনিধিরা চিনে যান, ১৯৯৬-এ ভারত-ভুটান চুক্তির সংশোধনের পরপরই ১৯৯৮-এ সম্পাদিত হয় চিন-ভুটান চুক্তি। ভারত এখনও ভুটানের বিভিন্ন জলাধার, বিদ্যুত ও শিল্প প্রকল্পে মূল বিনিয়োগ কর্তা, কিন্তু ভুটানের সার্বভৌমত্বের অভিভাবকত্ব সেদেশ আর ভারতের হাতে রাখতে চায় না। ২০১৭-এ ভারত-চিন-ভুটান সংলগ্ন ডোকলামে চিনের আগ্রাসনের প্রতিরোধে ভারত যে ভুটানের মত না নিয়েই সেনা পাঠিয়ে দেয়, ভুটান তা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি। ১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চুম্বি উপত্যকায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আমরা বন্ধু, কিন্তু ভুটানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব সার্বভৌমত্বে আমরা বিশ্বাস করি। তার বিদেশনীতি সে নিজেই ঠিক করুক।" নেহরুর দেওয়া ঐ পরিসরই ভুটান এখন দাবি করছে, সে দাবি অসঙ্গত নয় বলে অনেকেই মনে করছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়া : প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ার সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান, চীনের অভাবনীয় শক্তিবৃদ্ধি ও ভারতের নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম ভারতকে এই অঞ্চলের প্রতি মনযোগী হতে উৎসাহিত করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ায় (Pacific Asia) ভারতের স্বার্থ তিন ধরনের। প্রথমতঃ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া দাপট কিছুটা সংযত করা। এক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্ঘ (ASEAN) ভারতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। দ্বিতীয়ত, চীনের অপরিসীম শক্তিবৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে তার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভুত্ববাদী তৎপরতা সংযত করার জন্য ভারত ASEAN এর গঠনমূলক অংশগ্রহণের (Constructive engagement) নীতি গ্রহণে তৎপর হয়। তৃতীয়ত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ায় ভারতের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক বিনিয়োগের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এই অঞ্চলে নিয়োজিত এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের শতকরা ৪০ ভাগ এই অঞ্চলে নিবদ্ধ হয়। এই সমস্ত স্বার্থের কথা ভেবে ভারতবর্ষ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুলাই আসিয়ান (ASEAN) সংস্থায় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিবিড় সম্পর্ক, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও আশির দশকে ভারতের নৌশক্তির ব্যাপক মহড়া এখানকার দেশগুলির মনে ভারত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এখন অবশ্য ভারত সম্পর্কে মনোভাব অনকেটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তবে ভারতকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

Unit 10: The NAM, SAARC and the ASEAN relations with Sri Lanka

জোট-নিরপেক্ষতা:

জোট-নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে জে. ডবলিউ বার্টন উল্লেখ করেছেন যে এই নীতির মাধ্যমে সেই সমস্ত দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে বোঝায়, যারা ঠান্ডা লড়াইয়ের দরুন কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্য গোষ্ঠী এবং দুই বিবদমান শিবিরে যোগদান করেনি। কিন্তু জোট-নিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষতা বোঝায় না। তাই যদিও পূর্বে অনেক রাষ্ট্র নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিল, কিন্তু জোট-নিরপেক্ষতা কেবলমাত্র একটি নিরপেক্ষ নীতি নয়। এই নীতির কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমত, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা বা জোট-নিরপেক্ষতা কোন নিছক নেতিবাচক নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি নয়। জোট নিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে ভারত আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে অথবা আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকার ও নির্জোট আন্দোলনের বলিষ্ঠতম প্রবক্তা জওহরলাল নেহরু সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছিলেন যে জোট-নিরপেক্ষতা নিরপেক্ষতার নামান্তর নয়। নেহরুর ভাষায় যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন অথবা ন্যায়নীতি আক্রান্ত অথবা যেখানে আগ্রাসন সংঘটিত হয়, সেখানে নিরপেক্ষতা অর্থহীন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্দেশীয় সম্মেলনে নেহরু মন্তব্য করেন, "All countries of Asia have to meet together on an equal basis in a common task and endeavour" অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের তথা এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করতে পারলে বিবদমান দুই শক্তিশিবির থেকে তাদের মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারবে।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের উন্মেষে নেহরুর ভূমিকা: জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের স্থপতি ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু। ভারতের স্বাধীনতালাভের কয়েক মাস পূর্বে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতকে সকল জোট ও সামরিক, রাজনৈতিক চক্র থেকে মুক্ত রাখার কথা ঘোষণা করেন। এরপর ১৯৪৭-এর মার্চে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের স্বপক্ষে এশিয়ার দেশগুলির বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং শান্তি রক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি কার্যকর মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়।

নিজোট পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি: ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে এশিয়া মহাদেশে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চীনে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। এরপর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ প্রমুখ নিরপেক্ষ দেশগুলি দের থেকেই কোরিয়ার সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী হয়। কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে নেহরুর বক্তব্য হল কোন দুষ্পরিবর্তনীয় গতিহীন ধারণা নয়। একথা সত্য, ভারত যথাসাধ্যভাবে গোষ্ঠীগত ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। কিন্তু স্বাধীনতা ও শান্তি অবিভাজ্য, তাই যেখানে স্বাধীনতার অস্বীকৃতি অথবা যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল সেখানেই ভারত শান্তি ও স্বাধীনতার পাশে এসে দাঁড়াবে। জওহরলাল নেহর মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত পত্রে (১৫ জুলাই, ১৯৫০ খ্রি.) নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিকে

নিছক আদর্শবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী পররাষ্ট্রনীতি বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির অপর একটি মৌল উপকরণ হল যে এই নীতি শান্তির স্বার্থে নিয়োজিত। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের আবাদী সম্মেলনে নেহরু মন্তব্য করেছিলেন "কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে প্রতিবেশী দেশসমূহের শান্তিপূর্ণ সৌভ্রাত্রমূলক ও বিশ্বের সমস্ত দেশের সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি অর্জন করা সম্ভব।" শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করেছে। আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধে ও নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যপূরণেও ভারত নিরলসভবে প্রয়াসী। তৃতীয়ত, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতা এবং বর্ণবৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা ব্যক্ত হয়েছে। ভারত একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অশুভ ঐতিহ্য বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিরলস সমর্থন জানিয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত সর্বদা ইতিবাচক সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। চতুর্থত, ভারত জোট- নিরপেক্ষতা নীতি অনুসরণ করে এশিয়া তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি রচনা করতে চেয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে যুদ্ধ অবসানে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জেনেভা সম্মেলনের পর ইন্দো-চীনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্তর্জাতিক তদারকি কমিশন গঠিত হয় ভারত তার সদস্য ছিল। ইতিমধ্যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'প্রচণ্ড প্রতিশোধ' (massive retaliation) নীতি অনুসরণ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যে আঞ্চলিক সামরিক জোট স্থাপনে উদ্যোগী হয় এবং এইভাবে সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভারতবর্ষ এই দুটি সামরিক জোটে যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পণ্ডিত নেহরু এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি জোট- নিরপেক্ষ কূটনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতকে সামরিক বা অন্য কোন জোটবদ্ধ রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার নীতি ঘোষিত হয় ("avoidance of any entanglement in military or other alliances with tend to divide the world into rival groups")। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল ভারত ও চীন পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য পাঁচটি সূত্র উপস্থাপিত করে। এই সূত্রগুচ্ছ 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। এই পাঁচটি সূত্র হল-প্রত্যেকের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ, পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, সমমর্যাদা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। চীন ও ভারত উভয়েরই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতা ও সম্প্রীতির নিদর্শন স্থাপন করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর নেহরু ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটো দিল্লিতে এক যৌথ বিবৃতিতে জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় পর্যায়: বান্দুং সম্মেলন: অবশেষে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের প্রথমে এশিয়ার চৌদ্দটি রাষ্ট্র নতুন দিল্লিতে মিলিত হল। সমবেত রাষ্ট্রবর্গ পারস্পরিক ঐক্য শক্তিশালী করা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভিশালী করা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ম ২প্রংশে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংত্র ২মাইতি জাগনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

এরপর ঐ সম্মেলনের অনাত্মল সেবাশ্যহীদ্যোক্তা ছিল এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী আ আজিকার দেশ মিলিত হয়। ভারত মধ্যমণি। বান্দুং সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে নরী জওহরলাল নেহেকে ছিলেন সুখোলামেল বালুং সম্মেলনে দশটি নীতি অনুসরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ নীতিগুলি হল-(১) মৌলিক মানব শ্রবিকার এবং সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের সনদে সংযোজিত উদ্দেশ্য ও সংকীতিগুলি হল (১)মোদিত সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা স্বীকৃতি, (৩) ছোট বড় সকল বর্ণ ও জাতির সমানাধিকার, ২৪) অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, (৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে একক বা যৌথভাবে সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি, (৬) তো জাতিপুঞ্জের সুখদ অনুসারে একার স্বার্থ পালন থেকে বিরত থাকা এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি না করা, (৭) অন্য কোন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদের আচাদা পাছা আগ্রাসনের ভীতি প্রদর্শন অথবা বলপ্রয়োগ থেকে বিরতি, (৮) বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপস, আলাপ আলোচনা, সালিশী ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ ও মনোমালিন্যের মীমাংসা, (৯) পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা ও (১০) ন্যায়-নীতি ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মীমাংসা|

নেহরু, নাসের, সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়ার নেতা), নজুমা (ঘানার নেতা) ও মার্শাল টিটো ছিলেন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান নেতা ও প্রবক্তা।১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশনে নেহরু, নাসের, টিটো, সুকর্ণ এবং নজুমা জোট-নিরপেক্ষ নীতির অনুগামী রাষ্ট্রদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রস্তুতির বিষয়ে কায়রোতে প্রস্তুতি সম্মেলন আলোচনার জন্য ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৫-১২ই জুন কায়রোতে এশিয়া, ইওরোপ ও লাতিন আমেরিকার ২১টি দেশ মিলিত হয়। ঐ সম্মেলনে স্থির হয়, জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাবিত সম্মেলনে বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গৃহীত হবে। কায়রো সম্মেলনে পাঁচটি নীতি গৃহীত হয়। এই নীতিগুলিতে জোট-নিরপেক্ষতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে না হস্তক্ষেপ করা, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থন প্রভৃতি আদর্শ
তুলে ধরা হয়।

বেলগ্রেড সম্মেলনকে ধ'রে এপর্যন্ত মোট আঠারোটি নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে। এগুলো হল, বেলগ্রেড, যুগোস্লাভিয়া (১৯৬১), কায়রো (১৯৬৪), লুসাকা (১৯৭০), আলজিয়ার্স (১৯৭৩), কলম্বো (১৯৭৬), হাভানা (১৯৭৯), দিল্লি (১৯৮৩), হারারে, জিম্বাবোয়ে (১৯৮৬), বেলগ্রেড (১৯৮৯), জাকার্তা (১৯৯২), কলম্বো (১৯৯৫), ডারবান (১৯৯৮), কুয়ালালামপুর (২০০৩), হাভানা (২০০৬), কায়রো (২০০৯), তেহরান (২০১২), ভেনেজুয়েলা (২০১৬) এবং বাকু (আজারবাইজান, ২০১৯)। ১৯৭৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল আন্দোলনের সাংগঠনিক সভা, Co-ordinating Bureau। ঐ বছরেই উত্তর থেকে দক্ষিণে সম্পদ প্রবাহের ডাক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছে বেশি অর্থ সাহায্যের দাবি জানিয়ে নয়া অর্থনৈতিক প্রস্তাব (New Economic Order) রাখা হয়। নির্জোট গোষ্ঠীর এই প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যময় ছিল, কেননা, এই গোষ্ঠীতে যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও ছিল তেমনি ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেমন ছিল সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তেমনি ছিল একনায়কতন্ত্রী সামরিক রাষ্ট্র। রাজনৈতিক বিভিন্নতা আর উন্নত বিশ্বের নেতিবাচক চাপ সত্ত্বেও যে নির্জোট আন্দোলন নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল, তা খুব একটা কম সাফল্য নয়।

নির্জোট বৈঠকগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সপ্তম, অষ্টম ও একাদশ সম্মেলন। সপ্তম সম্মেলনে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে লেবাননে ইসরায়েলি আক্রমণ এবং গণহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। এই আন্দোলনের শরিক সব রাষ্ট্রই স্বীকার করেছিল, পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল প্যালেস্তিনীয়দের হারানো ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেওয়া এবং স্বাধীন সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া। অবশ্য বহু আগেই জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠী প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং এর রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াসের আরাফত দিল্লি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে ইরাক-ইরান যুদ্ধ, কাম্পুচিয়া এবং আফগান সমস্যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দাঁতাৎ এবং সহযোগিতার গুরুত্বের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া লাতিন আমেরিকার সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সপ্তম সম্মেলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই

সম্মেলনে Palestine Liberation Organization (PLO) এবং South West African People's Organization-এর প্রতি পূর্ণ সংঘবদ্ধ সমর্থন জানানো হয়।

সপ্তম সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির ব্যাপারেও জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠী প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল। কাম্পুচিয়া (কাম্বোডিয়া) থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহার, কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার দাবি জানানো হয়। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহার এবং শান্তিপূর্ণভাবে দুই কোরিয়ার পুনর্মিলনের দাবিও করা হয়েছিল। ইরাক-ইরান যুদ্ধের অবসানও এই সম্মেলনে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল।

অষ্টম সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলোকে (জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া, অ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি) দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক অবরোধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার লড়াইয়ে সাহায্য দেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সভাপতিত্বে আফ্রিকা তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের দাবিও করা হয়। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে লিবিয়ার ওপর মার্কিন হানার নিন্দা করা হয়। এছাড়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসেবে ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বর্ণ ও জাতিবিদ্বেষ, জিওনবাদ এবং সব রকমের আগ্রাসন, ভূখণ্ড দখল, হস্তক্ষেপ ও প্রাধান্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গীকারের পুনরুক্তি করা হয়।

১৯৬১-র ১লা সেপ্টেম্বর বেলগ্রেডে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পঁচিশটি সদস্যরাষ্ট্র এবং বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়াডের পরিদর্শকরূপে ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। নেহরু, নাসের , টিটো, সুকর্ণ, ইউনু, নজুমা, সিরিমাভো বন্দরনায়েক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলনে দুটি দলিল অনুমোদিত হয়। এই দলিল দুটিতে জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা যুদ্ধের বিপদ ও শান্তির স্বপক্ষে অভিমত এবং সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মূলোৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদি বান্দুং সম্মেলন ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্মদাত্রী, তাহলে বেলগ্রেড সম্মেলন ছিল এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি।

যদিও বেলগ্রেড সম্মেলনে নির্জোট আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লুসাকা সম্মেলনে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। ঐ সম্মেলনে তিনটি মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-প্রথমত, প্রতি তিন বছর অন্তর শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়ত, জোট-নিরপেক্ষ সংস্থার একজন সভাপতি থাকবেন। জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কাউন্ডা প্রথম সভাপতি হলেন। তৃতীয়ত, নির্জোট আন্দোলনের কার্যনির্বাহের জন্য একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কাঠামো সমন্বয়কারী সংস্থা (Coordinating Bureau) নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নির্জোট আন্দোলনের সপ্তম শিখরসম্মেলনে ভারত সভাপতি নির্বাচিত হয়। এই সম্মেলনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দাঁতাত, দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনের সভানেত্রীরূপে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর দক্ষিণ আলোচনা, নতুন অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা গঠন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির যৌথ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। এরপর হারারেতে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত শীর্ষসম্মেলানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি গভীর সমর্থন ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি উন্নতনশীল দেশগুলির প্রতি নীতিহীন ও অসম অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন।

রাজীব গান্ধীর সময় গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলন বর্ণবৈষম্যবাদ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম এই দুটি প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ সম্মেলন আক্রমণ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য অর্থভাণ্ডার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় যা AFRICA (Action For Resisting Invasion, Colonialism and Apartheid) নামে পরিচিত। আফ্রিকার দক্ষিণভাগের প্রান্তিক দেশগুলির (Frontline) অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংস্থাটি নিয়োজিত হয়। তবে এছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার গণসংস্থা (SWAPO) দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। রাজীব গান্ধী এই প্রচেষ্টাকে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার প্রথম যৌথ প্রয়াস ('It was perhaps the first concrete manifestation of a united effort based on effective South-South cooperation") বলে অভিহিত করেছেন। একই সঙ্গে নামিবিয়ার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধিতা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। ভারতবর্ষ ও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলন বর্ণবৈষম্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার অবসান দুটি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের অধিনায়ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস (ANC)-এর সভাপতি নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তিলাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে নেলসন ম্যান্ডেলা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। নামিবিয়ার স্বাধীনতার বিষয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে। নতিস্বীকার করতে হল। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নামিবিয়া স্বাধীনতালাভ করে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল ১৯৯০ সালের পর যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের ফলে দুই মেরুভিত্তিক আন্তর্জাতিক কূটনীতির অবসান ঘটে, ফলে জোটনিরপেক্ষতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়। অন্যদিকে বিশ্বব্যবস্থায় রাজনীতি বা কূটনীতির চাইতে অর্থনৈতিক বিভাজনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্মসূচি এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। তাই ১৯৯৫ সালের একাদশ কলম্বো সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও ঘোষণা করেছিলেন, জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর পরবর্তী লক্ষ্য হবে তার লক্ষ্যের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া এবং নতুন কর্মসূচি নির্ধারণ করা। এছাড়া মার্কিন একাধিপতা প্রতিরোধ করা এবং উন্নত অর্থনৈতিক বিশ্বের সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে উন্নতিশীল বিশ্বের জোট হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাও এই সম্মেলনে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। দুটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত এবং উন্নত বিশ্বের মারণাস্ত্রভিত্তিক চাপ বিশেষত পারমাণবিক কূটনীতি সংক্রান্ত বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলম্বো সম্মেলনে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার আমূল সংস্কার হয় কারণ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর মতে, প্রধানত জি-৭ (পরে জি-৮) গোষ্ঠীভূক্ত উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যই এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কাজ করে। এখানে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির নিজস্ব অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর জোর দেওয়া এর। কলম্বিয়ার বিদেশমন্ত্রী Rodrigo Garcia Pena উন্নত বিশ্বের পারমাণবিক চাপের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ কূটনীতির উদ্ভবের জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি আহবান জানান। নিউইয়র্কের Lawyer's Committee for Nuclear Policy জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির পক্ষে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কলম্বো সম্মেলনের মনোভাবই পরে প্রতিফলিত হয় ১৯৯৭ সালের দিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার বাতিল করার দাবি জানানো হয়, এবং রাষ্ট্রসংঘ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন নীতি দ্বারা প্রভাবিত বলে সমালোচনা করা হয়। এছাড়া এই সম্মেলনে প্যালেস্তিনীয় প্রশ্নে ইসরায়েলের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ইসরায়েলকে মদত দেবার জন্য মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনাও করা হয়েছিল। এর পরের নির্জোট সম্মেলনটি বসেছিল ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কিউবার রাজধানী হাভানায়। ভারতের পক্ষে এই সভার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ১১৮টি দেশের প্রতিনিধিরা ৯১ পৃষ্ঠার যে ঘোষণাপত্র এই সম্মেলনে প্রকাশ করেছিলেন, সেই ঘোষণায় ভারতীয় উপমহাদেশের সন্ত্রাসবাদ সমস্যার ব্যাপারে ভারতের অবস্থানকে

সম্পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছিল, তালিবান জঙ্গিদের মদতদাতা হিসেবে পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করা হয়েছিল, আর সেই সঙ্গে মার্কিন পুলিশ-রাজেরও নিন্দা করা হয়েছিল। তাছাড়া এই নির্জেটি শীর্ষ বৈঠকেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ ভারতের মুম্বাই বিস্ফোরণের নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সন্ত্রাস দমনে যে 'যৌথ কাঠামো' বা 'জয়েন্ট মেকানিজম' গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই প্রস্তাব মেনে সহযোগিতার আশ্বাসও দিতে হয় পাক-প্রেসিডেন্টকে।

পনেরোতম নির্জোট সম্মেলন হয় মিশরের শরম এক শেখ-এ, ২০১২ সালের ১৫ জুলাই। ১১৮টি সদস্য-রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে এই সভাতেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের স্বার্থে যৌথ প্রয়াসের ওপর জোর দেওয়া হয়। শুরুতেই বিদায়ী চেয়ারম্যান, কিউবার প্রেসিডেন্ট, রাউল কাস্ত্রো নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহবান জানান। আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বিভিন্ন রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এককথায়, ১৯৯৫ সালের কলম্বো সম্মেলনে নির্জেটি আন্দোলনের যে দিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তাই পূর্ণ হয় ২০১২ সালে।

আজারবাইজান-আর্মেনিয়া বা ইসরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষের মতো আঞ্চলিক লড়াইগুলোর অবসান বা রাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতার পাশাপাশি বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের উন্নয়মুখী সহযোগিতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় আঠারোতম বাকু সম্মেলনটিতে। মনে করিয়ে দেওয়া হয় দোহা গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবটিকে বাণিজি সমঝোতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর বিষয়টিকে। প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বয়ম্ভরতার যাতে 'Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC)' সফল হয়, তার জন্যও সবাইকে উদ্যোগী হতে বল হয় এই সম্মেলনে।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে একই অঞ্চলের অন্তর্গত নয়। এই দেশসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ইওরোপ মহাদেশে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, ছোট- নিরপেক্ষ আন্দোলনের দেশগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমধর্মীয় নয়। কিউবা, আঙ্গেলা যুগোশ্লাভিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক সমাজব্যদের সমর্থক, মিশর, ইরাক, ঘানা প্রভৃতি দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রচলিত। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশ জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঔপনিবেশিকতা- সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী জোটের ঘোর বিরোধী, সমাজতন্ত্রী শিবিরের সঙ্গে ভারত, মিশর প্রমুখ দেশগুলির সুসম্পর্ক বিরাজমান অন্যদিকে পাকিস্তান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ পাশ্চাত্য শক্তিজোটের সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। চতুর্থত, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতাদের ধ্যান-ধারণাও অভিন্ন নয়। যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো সোভিয়েত প্রাধান্য থেকে মুক্ত রাখার জন্য গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে নাসের-এর কাছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার কোন নীতিগত বা আদর্শগত ভিত্তি ছিল না, মিশরের রাজনীতিতে নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য ও আরব জগতে নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পাশ্চাত্য-বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন। সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার মাধ্যমে নিছক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছিল। কিন্তু নেহরুর কাছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা ছিল দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বে যুদ্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ, তাঁর কাছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা ছিল এক নৈতিক ধারণা, শান্তিকে জয় করার একমাত্র কর্মপন্থা। বিভিন্নতা ও মতভেদ সত্ত্বেও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল, তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপন করে যেমন তাদের গোষ্ঠী রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে বিশ্বরাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সংঘবদ্ধ হওয়ার এক মঞ্চ পায়। এর ফলে

বিশ্বরাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিগুলির পদলেহনকারী না হয়ে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক উইলিয়াম কেলর মন্তব্য করেছেন, "The ultimate objective of Nehru and his disciples was the formation of a cohesive bloc of third world nations recently emancipated from European rule which would promote the cause of world peace by declining all participation in the cold war between the powers" বিশ্বরাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষায় সফল হয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ভারত, মিশর প্রমুখ দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী হস্তক্ষেপ নীতি বাধার সম্মুখীন হয়। ভিয়েতনাম, মধ্য-প্রাচ্য প্রভৃতি স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ রাজনীতির (Policy of brinkmanship) আত্মঘাতী ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হল। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্তরের দশকের প্রারম্ভে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হেনরি কিসিংগার সংঘাত নীতির পরিবর্তে উত্তেজনা প্রশমনকারী দাঁতাত (detente) নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হন। তাই সামগ্রিক বিচারে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতিতে আবদ্ধ বিশ্বরাজনীতিতে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তৃতীয় বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠন

নির্জোট আন্দোলন শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এটাও ঠিক যে, একাদশ সম্মেলন থেকে অর্থনৈতিক লক্ষ্যের ওপর জোর দিলেও এর রাজনৈতিক মাত্রা একেবারে হারিয়ে যায়নি। কিন্তু দুই মেরু কূটনীতিজ অবসানে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলায় নির্জেটি আন্দোলনের দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। একদিকে মার্কিন একাধিপত্য ও বিশ্বায়নের চাপ, আর অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা, আর সেই অবস্থায় নির্জেটি গোষ্ঠীর দুর্বলতা-এইসবই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক স্বার্থে আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ধরনের দুটো সংগঠনের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। একটি হল 'আসিয়ান' (ASEAN-Association of South-East Asian Nations) এবং অনাটি হল সার্ক (SAARC-South Asian Association for Regional Co-operation)

আসিয়ান (ASEAN)

১৯৬১ সালের Association of South East Asia (ASA) এবং ১৯৬৩ সালের MAPHILINDO (মালয়, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া) এই দুটি সংগঠনের যৌথ ও পরিণত কাঠামোটিই ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট ASEAN হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছিল জুলাই (১৯৬৭)-এর ব্যাংকক ঘোষণা, আর এর শিরদাঁড়াকে দৃঢ়তর করা হয়েছিল ১৯৭৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে (ASEAN Concord)। সেখানেই করা হয় 'Treaty of Amity and Cooperation চুক্তিটি।

প্রথমে ASEAN-এর সদস্য হয়েছিল পাঁচটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ: থাইলান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন্স। ১৯৮৪ সালে এর সদস্য হয়। ব্রুনেই; ১৯৯৫ সালে যোগ দেয় ভিয়েতনাম। ১৯৯৭ সালে এর তিন দশকের পূর্তি হয়। তখন এর আরও তিন সদস্য লাভ হয়, লাওস, কাম্বোডিয়া ও মায়ানমার (বার্মা)।

একতা আর উন্নয়ন, এই ছিল ASEAN-এর সদস্যদের ঘোষিত আদর্শ। ব্যাংকক ঘোষণায় একে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর সরকারি প্রয়াস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল পাঁচটি:

সদস্যদের মধ্যে কৌ। এবং শান্তি ও স্থিতি রক্ষা। কোনও বড়ো শক্তি যদি কোনও এক সদস্যরাষ্ট্রে 1 প্রমরিক ঘাঁটি বসাতে চায়, তাহলে তা সম্পূর্ণ ওই রাষ্ট্রটির সার্বভৌম ইচ্ছা ও কমাতি-সাপেক্ষ হবে, এ ব্যাপারে কোনও চাপ সহ্য করা হবে না বা ওই রাষ্ট্রের পারভৌমত্ব বা উন্নয়নের প্রশ্নে কখনোই কেনো আপস করা হবে না, এমনই প্রতিজ্ঞা করেছিল আসিয়ান।

২০২১-এর অক্টোবরে ব্রুনেই-তে আসিয়ানের যে শীর্ষ সম্মেলন হয়, তাকে ধরে এপর্যন্ত মোট ৩৯টি সম্মেলন হয়েছে আসিয়ানের। সামরিক অভ্যুত্থানের দায়ে অভিযুক্ত মায়ানমারকে ছাড়াই এই সম্মেলন হয়েছে এবং এর আগে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যার্থতায় যেমন সমালোচনা হয়েছিল তার, এবারও তেমনি আসিয়ান বৈঠকে ভৎসিত হতে হয়েছে মায়ানমারকে। সেইসঙ্গে আলোচিত হয়েছে করোনা মহামারীর ধাক্কায় বিপর্যস্ত দেশগুলোর সংকট মুক্তির জন্য আসিয়ান-এর দায়িত্বের কথা।

আসিয়ান ২০০৭ সালের নভেম্বরে সিঙ্গাপুরের ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনে একটা বড়ো কাজ করতে পেরেছে। এই সম্মেলনের সূত্রেই বসাতে পেরেছে তৃতীয় পূর্ব-এশীয় শিখর বৈঠক (Third East Asia Summit)। সেখানে সম্পাদিত হয়েছে 'Singapore Declaration on Climate Change, Energy and Environment'. একই সঙ্গে জাপ-প্রতিনিধিদের সঙ্গে এশীয় নেতৃত্বের একাদশতম সভা বসেছে, বসেছে ভারতের সঙ্গে তাদের ষষ্ঠ বৈঠক। তিনটে উল্লেখ করবার মতো ঘোষণা হয়েছে। এক, আসিয়ান- জাপান এবং আসিয়ান-কোরিয়া আর্থিক, বাণিজ্যিক ও পরিষেবামূলক সহযোগিতার ঘোষণা; দুই, আসিয়ান অর্থনৈতিক গোষ্ঠী পরিকল্পনার ঘোষণা (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint); তিন, ঘাতসহ পরিবেশ নির্মাণের ঘোষণা (Declaration on Environmental Sustainability)। সবচাইতে বড়ো কথা, এই সিঙ্গাপুরেই প্রথম ASEAN Charter স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার সাক্ষী থেকেছেন সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা।

রাজনৈতিক প্রশ্নে প্রতিজ্ঞা কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি আসিয়ান। ১৯৭১ সালে সাহস করে Declaration on the Neutralisation of South East Asia করেছিল, আর ১৯৮৪ সালে কাম্পুচিয়া (কাম্বোডিয়া) প্রসঙ্গে সার্বভৌমত্বের পক্ষে জাকার্তা প্রস্তাব নিয়েছিল, কিন্তু ওই ঘোষণা বা প্রস্তাবই সার। রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক নিয়মিত হয়নি কখনো। ১৯৭৭ সালের পর বেশ কয়েক বছর শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজনই করা যায়নি। আসিয়ানের এই দুর্বলতার প্রধান কারণ ছিল এই অঞ্চলে জাপানকে ঠেকানোর দায়ে চিন-মার্কিন বোঝাপড়া, রূপান্তরে মার্কিন চাপ।

আসিয়ানের রাজনৈতিক ব্যর্থতার আরও কারণ আছে। প্রথমত, সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়ার তুলনায় ইন্দোনেশিয়া বড়ো রাষ্ট্র হওয়ায় বিদেশনীতির স্বার্থ এক নয় অসম মানসিকতার সমস্যাও আছে। দ্বিতীয়ত, সাবা ভূখণ্ডের ব্যাপারে মালয়েশিয়ার (২০ সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াই-এর সমাধান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা তৃতীয়ত, যৌথ নিরাপত্তার কোনও কার্যকর পরিকল্পনা আসিয়ানের নেই। চতুর্থত, মার্কিন নিয়ন্ত্রিত Pacific Community-র প্রয়াস আসিয়ানের ভবিষ্যতের মুখে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে। পঞ্চমত, দক্ষিণপন্থী এবং বাহ্যত বামপন্থী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণেরও তবে এটাও ঠিক যে, আসিয়ান নিজেও তার রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচ্ছে। তাই প্রথম থেকেই সচেতনভাবে আসিয়ান রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্য এড়িয়ে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়েছে। একটি অভিন্ন বাজার বা মুদ্রা সে চালু করতে পারেনি বটে, কিন্তু তার পঁয়ত্রিশ বছরের অস্তিত্বে তিনটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এর মধ্যে আছে সুবিধাজনক শুল্ক চুক্তি (Preferential Trade Agreement-PTA); শিল্প-সহযোগিতার চুক্তি (ASEAN Industrial Co-operation-AIC) আর যৌথ শিল্প উদ্যোগ (ASEAN Industrial Joint Ventures-AIJV)। এরকম আর একটি চুক্তি হল, ইন্দো-আসিয়ান যুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (২০১৪)। Asian Free Trade Association বা AFTA গড়ে তোলাও আসিয়ানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সার্ক (SAARC)

আসিয়ানের (ASEAN) সঙ্গে ভারত বরাবরই ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ভারতের মতো বড়ো দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আসিয়ান-ও সবসময়েই আগ্রহী। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য আর একটি আলাদা সংস্থার প্রয়োজন ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল বা মালদ্বীপের মতো ছোটো ছোটো দেশ এইধরনের সংগঠন বেশি করে চেয়েছিল। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই ১৯৮৫ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল সার্ক, সদস্যদের মধ্যে ছিল ভারত, ভুটান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। সার্কের সনদ অনুসারে আঞ্চলিক সংস্থাটির উদ্দেশ্য হল অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার দ্রুত উন্নয়ন, পারস্পরিক আস্থা, যৌথ চেষ্টায় প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বনির্ভরতা, বিজ্ঞান ও কারিগরির যৌথপ্রয়াস-এইসব। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসদমন, জনস্বাস্থ্য, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা, শিশুকল্যাণ, আবাসন সমস্যার সমাধান, উদ্বাস্তু সমস্যা, পরিবেশ রক্ষা এইসব।

এ পর্যন্ত সাকের ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলন হয়েছেঃ ঢাকা (১৯৮৫), বাঙ্গালোর (১৯৮৬), কাঠমান্ডু (১৯৮৭), ইসলামাবাদ (১৯৮৮), মালে, মালদ্বীপ (১৯৯০), কলম্বো (১৯৯১), ঢাকা (১৯৯৩), দিল্লি (১৯৯৫), মালে (১৯৯৭), কলম্বো (১৯৯৮), কাঠমান্ড (২০০২), ইসলামাবাদ (২০০৪), ঢাকা (২০০৫), নতুন দিল্লি (২০০৭), শ্রীলঙ্কা (২০০৮), ভূটান (২০১০), মালদ্বীপ এবং কাঠমাণ্ডু (২০১৪)। ১৯তম সম্মেলনটি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভারতের উরিতে জঙ্গি হামলা ও তার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করার প্রেক্ষিতে ভারত ঐ সম্মেলনে যোগ মিে অস্বীকার করে, অন্য পাঁচটি রাষ্ট্রও সেই প্রতিবাদে সামিল হয়, অর্থহীন হয়ে যায় সার্ক বৈঠক।

১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সার্ক-এর (SAARC) ছিল ঘর গোছানোর পর্ব। ১৯৯১ সালের কলম্বো সম্মেলনে সার্ক আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিরোধের কথা বলে। কেননা, বিশ্বব্যবস্থায় তখন অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, মার্কিন একাধিপত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, উপসাগরীয় যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইরাক, দক্ষিণ এশিয়ায় নগ্ন হয়ে উঠেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর যুগের কঠিন বাস্তবতা। ফলে সার্কের সদস্যরা তখন অনেকবেশি সতর্ক। ১৯৯২ সালে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশের তিক্ততা সত্ত্বেও তাই সার্ক ঢাকার সপ্তম সম্মেলনে 'সাপটা' (SAPTA-South Asian Preferential Trade Agreement) সম্পাদন করতে পেরেছিল। অষ্টম সম্মেলনে, দিল্লিতে পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নের আন্তর্জাতিকায়নের চেষ্টা করে। পরিবেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সহযোগিতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন নেপালের রাজা বীরেন্দ্র। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সাফটা (SAFTA-South Asian Free Trade Area) গড়ে তোলার। কলম্বোয় দশম সম্মেলন থেকে সার্ক-এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু বিস্ফোরণ উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার ওপর ছিল শ্রীলঙ্কার তামিল বিদ্রোহ, কাশ্মীরের সন্ত্রাস নিয়ে শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তানের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। পরের কাঠমান্ডু সম্মেলনেও ছিল অস্থির পরিবেশ। মার্কিন ট্রেড সেন্টারের ওপর 'আল-কায়দা'র জঙ্গি হানার প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস দমনের নামে আমেরিকা তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ভেতরের রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানে শুরু হয়েছে মার্কিন হামলা। কারগিল যুদ্ধ আর ব্যর্থ আগ্রা বৈঠকের পর ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা তখন চরমে। নেপালে রাজা বীরেন্দ্রর হত্যাকাণ্ড, সেখানে মাওবাদী গেরিলাদের হামলা, শ্রীলঙ্কার তামিল প্রশ্নে ভারতের ভূমিকায় শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিমা কুমারতুঙ্গার অসন্তোষ- সব মিলিয়ে সেই পরিস্থিতি মোটেই সহযোগিতার নয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্পষ্টই সার্কের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান প্রকাশ করেছিলেন। মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মামুন আবদুল গায়ুম হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতিতে, নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা মাদক চোরাচালান আর আন্তর্জাতিক অপরাধজগৎ সম্পর্কে সার্ক-এর ভূমিকাকে অসম্পূর্ণ বলেছিলেন। ভারতের

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলেছিলেন, ভারত-বাংলাদেশে-নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে 'উন্নয়নমুখী চতুর্কাঠামো (Growth Quadrangle) গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বিরোধিতা করেছিল শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। অন্যদিকে নেপালের কোনও কোনও কূটনীতিবিদ চিন ও মায়ানমারকেও সার্কের বৃত্তে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেনও। তা'তে ভারতের মনে হয়েছিল, জোট দেশগুলো তার বিশাল উপস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে চিনের সাহায্যে "Counter-balance of Power" তৈরি করার কথা ভাবছে। ভারত তাই নজর দিয়েছিল বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডকে নিয়ে গড়ে ওঠা 'বিমসটেক' (BIMSTEC)-এর ওপর। এককথায়, সার্ক তখন গভীর সংকটে। ২০০৪ সালে ইসলামাবাদ সম্মেলনে ভারত যোগ দেবে কিনা, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল বেশ কিছু সময় ধরে। এর কারণ, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের অনমনীয়তা। ভারতে দুটো শর্ত রেখেছিল, এক, কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানি সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে এবং দুই, পাকিস্তানের তরফে ভারতকে 'Most Favoured Nation'-এর মর্যাদা দিতে হবে। পাকিস্তান প্রথমে চুপ করে থাকলেও শেষপর্যন্ত নমনীয় হওয়ায় ভারত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল, ২০০৬ সালের মধ্যে সাফটা চালু করার কথাও বলেছিল, কিন্তু তবুও সার্ক-এর চোরা উত্তেজনা থেকেই যায়।

এর পরের সার্ক সম্মেলনটিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সন্ত্রাসের লাগামছাড়া বিস্তারের ফলে। সভা হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। কিন্তু একের পর এক বিস্ফোরণ, সেদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাম্স কিবরিয়ার হত্যাকাণ্ড পরিবেশকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। নেপালেও ইতিমধ্যে রাজবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়। শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় ১৩তম সার্ক সম্মেলন হয়।

সম্মেলনে প্রথম থেকেই একটা চাপা উত্তেজনা ছিল। কেননা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সীমান্তরিক সন্ত্রাসবাদের (cross border terrorism) বিপদের কথা মনে করিয়ে দেন এবং পাকিস্তানের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের মনে যে অবিশ্বাসের ভাব আছে তার ইঙ্গিত দেন। তবে এই সম্মেলনেই এলাকা বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানকে সদস্যপদ দেওয়ার পক্ষে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং সহযোগী সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার চিনা ও জাপানি মনোভাবকে স্বাগত জানানো হয়। SAFTA চালু করার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার কথাও বলা হয় এই সম্মেলনে।

কিন্তু সার্ক একটি বড়োসড়ো ধাক্কা খায় ২০০৬ সালে। ওই বছর জুলাই মাসে সাফটা'র প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় একটি আলোচনায় বসেছিলেন সার্ক বিদেশ সচিবরা। আলোচ্যসূচির প্রথমেই ছিল সার্ক সদস্য দেশগুলোর চিহ্নিত রপ্তানি পণ্যের ওপর ধার্য বাণিজ্যকর। আলোচনা ছাড়াই একতরফাভাবে পাকিস্তান সাতশো পণ্যকে চিহ্নিত করেছে এই অভিযোগ তুলে প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ান ভারতের বিদেশ সচিব শ্যাম সরণ। পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এরকম মন্তব্য করেন তিনি। অন্যপক্ষে ভারতকে কূটনৈতিক অসৌজন্যের দায়ে অভিযুক্ত করেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী রিয়াজ আহমদ খান। পারস্পরিক এই দোষারোপের আবহাওয়ায় সাফটার বৈঠক ভেস্তে যায়। তবে বাণিজ্য কর নিয়ে মতবিরোধটাই আলোচনা নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল না। বৈঠকের ঠিক আগে আগেই ভারতের মুম্বাই শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং এই সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ভারত পাকিস্তানের হাত দেখতে পেয়েছিল। পাকিস্তান চেয়েছিল সচিব পর্যায়ের আলোচনায় এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে। কিন্তু তার আগেই সার্কের মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে প্রশ্নটি তুলে ভারত পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে দেয়। এটাই সম্ভবত ছাপ ফেলে সাফটার বৈঠকে।

সার্ক-এর ১৪তম সম্মেলনে (নতুন দিল্লি, ২০০৭) অবস্থা কিছুটা সামলানোর চেষ্টা হয়। সাফটা-র প্রতিশ্রুত পদক্ষেপগুলো ঠিকঠাক নেওয়ার কথা বলা হয় সেখানে। তাছাড়াও একটি দক্ষিণ-এশীয় সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়, একটি শুল্ক সংঘ (South Asian Customs Union), একটি অর্থনৈতিক সংস্থা (South Asian Economic Union) এবং একটি উন্নয়ন তহবিল

(SAARC Development Fund) গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়। বলা হয় দারিদ্র্য, মহামারী, অর্থনৈতিক বিপর্যয় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে আঞ্চলিক সংহতির কথা। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ঐক্যের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়, কেননা সদস্যদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘোচাতে পারেনি সার্ক। ২০১৪ সালের কাঠমান্ডু সম্মেলনে তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্টই বলেছিলেন, "As SAARC we have failed to move with the speed that our people expect and want from us. Is it because we are stuck behind the walls of our differences and hesitant to move out of the shadows of the past?"

আসলে সার্ক-এর গোড়া থেকেই একটা বড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত যেমন বরাবরই নেতৃত্বের দাবিদার, তেমনি জোট দেশগুলো সবসময়েই ছিল সেই নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। ভারতের স্বাভাবিক কর্তৃত্বই তাই তাদের কাছে প্রভুত্বের সমার্থক হয়ে গেছে। বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান আঁতাত করতে গেছে চিনের সঙ্গে। অন্যদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, চিনই ভারতের পক্ষে সবচাইতে বড়ো বিপদ। ভারত তাই African Union-এর আদলে South Asian Union (SAU) গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছে, কিন্তু এতে খুব আগ্রহ দেখায়নি অনেক রাষ্ট্রই। তাছাড়া। তোলাভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান তিক্ততা আর দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো। থেকে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ ভারতকেও ক্রমশ অসহিষ্ণু করে তুলেছে। তার ওপর আছে নিরাপত্তার ধারণায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তিয়া ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। সুতরাং আদর্শের দিক থেকে যাই বলা হোক না কেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলো যদি উন্নত না হয়, তাহলে সার্ক-এর পক্ষে আবার কার্যকর সংগঠনে পরিণত হওয়া খুবই কঠিন।

ভারত এবং শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক:

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি দুটি সমান্তরাল বৃত্তে পরিচালিত হয়েছে-আন্তর্জাতিক বৃত্ত ও আঞ্চলিক বৃত্ত। নেহরুর সময়ে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ততটা আঞ্চলিক বৃত্তের ওপর দৃষ্টি দেয়নি, কিন্তু সত্তরের দশক থেকে ভারত দক্ষিণ-এশিয়ায় রাজনীতির ওপর গুরুত্ব দিতে থাকে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই এই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে একে অন্যকে প্রতিহত করতে চেয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই দক্ষিণ-এশীয় দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আশির দশকের আগে পর্যন্ত দক্ষিণ-এশীয় সহযোগিতা সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়নি। এর মূলে দুটি কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলি নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুনিশ্চিত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে, অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে বেশি আকৃষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে এই অঞ্চলের দেশগুলির মনে আশঙ্কাবোধ সৃষ্টি হয়। তথাপি ইওরোপীয় আঞ্চলিক মিত্রতা বলয়ের মতো এখানেও একটি যৌথ সংস্থ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে সাতটি দক্ষিণ-এশীয় দেশের পররাষ্ট্রসচিবগণ দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি (South Asian Association for Regional Co-operation) গঠন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তবে সার্ক গঠিত হলেও এরফলে ভারত তেমন লাভবান হয়নি। একমাত্র মালদ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সহজ বধা দেখা দেয়। সার্ক-এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতি সহযোগিতার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে দক্ষিণ-এশিয়ায় শান্তি স্থাপনেও সার্ক তেমন সফল হয়নি। ভুটান, বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানের প্রভাব অব্যাহত ছিল । ভারতের ভেতরে ও কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উগ্র সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্ন তৎপরতায় পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে মদত দিয়ে আসছিল এই পর্বে।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের মূল নির্ধারক ছিল সে দেশের ভেতরে সিংহলী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিবাসী ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলদের বিরোধ। তামিলরা শ্রীলঙ্কায় স্বায়ত্তশাসিত নাগরিক অধিকার চেয়েছিল এবং সিংহলী-তামিল বিরোধের সূত্রে বেড়ে ওঠা তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (TULF) ও পরে লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম (LITE)-এর চরমপন্থার দাপটে জাফনায় 'তামিল ইলম' বা স্বতন্ত্র তামিল ভূমির দাবি আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬৪ সালের বন্দরনায়েক-শাস্ত্রী চুক্তির সময় থেকেই ভারত ওই জাতিপ্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শ্রীলঙ্কার সরকার ভারতের সহযোগী হলেও তামিল চরমপন্থীরা ভারত-বিরোধিতায় শামিল হয়েছে আর সেই সুযোগে ভারত-শ্রীলঙ্কা বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বিপন্ন করে শ্রীলঙ্কায় চিনা পুঁজির অনুপ্রবেশ একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

আশির দশকে দক্ষিণ-এশিয়ার রাজনীতিতে শ্রীলঙ্কায় তামিল উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের কার্যকলাপের ফলে গভীর সংকট সৃষ্টি হয় এবং ভারতের ভাবমূর্তি মলিন হয়ে পড়ে। উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকেই তামিল উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা শুরু হয়। তবে ইতিপূর্বেই সত্তরের দশকের শেষদিক থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল ও সিংহলীয়দের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয়। সিংহলী তামিলগণ শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে বসবাস করতেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (TULF) তামিলদের জন্য শ্রীলঙ্কায় স্বতন্ত্র বাসভূমি (তামিল ইলম) এর দাবি জানায়। অন্যদিকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তামিলদের বিরুদ্ধে সিংহলীরা আক্রমণ চালায়। জাতিগত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত তামিলদের এখনও পুনর্বাসনে ভারত সাহায্যদানের প্রস্তাব দেয়। তামিলদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে কমিউনিস্ট পার্টি ও জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (JVP) বিশেষভাবে দায়ী ছিল। শ্রীলঙ্কার তামিল প্রতিরোধকরা বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় সমুদ্র উপকূলের রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নেয় এবং সেটা ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত তামিলদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতা দেখে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধন ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমস্যা সমাধানে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য, আঞ্চলিক অভিভাবকত্ব প্রসার করা থেকে বিরত থাকতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। এদিকে শ্রীলঙ্কা থেকে শরণার্থী তামিলগণ ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলাম যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজী হয়। ১৯৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে। এই আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসেন রাজীব গান্ধি। ঠিক হয়, শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বের দুটো প্রদেশকে এক করে স্বায়ত্তশাসিত একটি তামিল প্রদেশ গঠন করা হবে, সরকারি ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হবে এবং তামিল চরমপন্থীদের হটিয়ে দেওয়া হবে। এই সময়ে LITE-কে শায়েস্তা করবার জন্য জয়বর্ধনে ভারতের সাহায্য চান এবং রাজীব গান্ধি সেই অনুরোধ রক্ষা করে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তি-সেনা (Indian Peace Keeping Force-IPKF) পাঠিয়ে দেন। এটা ছিল ভারতীয় বিদেশনীতির অন্যতম ব্যর্থ পদক্ষেপ। ভারতীয় সেনার দমননীতি তামিলদের কাছে ভারতকে শত্রু দেশে পরিণত করে, অথচ অপরিচিত বনাঞ্চলে লক্ষ্য পূরণেও ব্যর্থ হয় ভারতীয় সেনা। ফলে শ্রীলঙ্কায় একটি স্থায়ী ভারত-বিরোধী প্রতিরোধ কেন্দ্র তৈরি হয়ে যায়, যা নরসিমহা রাও-এর আমলে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট প্রেমদাসার কথামতো সেনা প্রত্যাবর্তনের পরও দুর্বল হয়নি বা ভারত-শ্রীলঙ্কা বাণিজ্য চুক্তির (Free Trade

Agreement, 1998) আড়ালে ঢাকা পড়েনি। যদিও জঙ্গী তামিল গোষ্ঠীদের অনেকেই এই চুক্তিকে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু সিংহলীরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়।

চুক্তির শর্ত অনুসারে তামিল বিদ্রোহীরা অস্ত্রসম্বরণ করেনি। তবে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ভারত শান্তিবাহিনী শ্রীলঙ্কায় পাঠায়। পরে তামিল নেতা প্রভাকরণ তামিল জঙ্গীদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনীর ওপর ইতস্তত আক্রমণ চলে। এরপর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রণসিঙ্গে প্রেমাদাসা শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় শান্তিসেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ভারতীয় শান্তিসেনা প্রত্যাবর্তনে গড়িমসিতে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি ক্ষুব্ধ হন এবং অভিযোগ করেন ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীলঙ্কায় থাকার জন্যই অশান্তি অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ভারতে জাতীয় ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল জানান যে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মার্চের মধ্যে শ্রীলঙ্কা থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হবে।

একুশ শতকের গোড়া থেকেই চিনের হস্তক্ষেপে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্কে নতুন সমস্যা তৈরি হয়। দ্বীপরাষ্ট্রের ওপর যত নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে থাকে চিন, ততই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক-রক্ষা শ্রীলঙ্কার শাসকগোষ্ঠীর অস্বস্তির কারণ হয়। তার জেরেই কলম্বো বদরে ইস্ট কন্টেনার টার্মিনাল প্রকল্প ভারতের হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়। দুবাই, সিঙ্গাপুরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কলম্বোর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে গেলে কলম্বোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে চিনের অতি-আগ্রহের কারণ সেটাই। কিন্তু তাতে ভারতের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা-প্রতিদ্বন্দিতা তাই অনিবার্য। ২০১৭ সালে চিনের বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ করতে না পারায় হাম্বানটোটা বন্দর নিরানব্বই বছরের লিজে চিনা সংস্থার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় শ্রীলঙ্কা। এতে ভারতের পাশাপাশি আমেরিকাও উদ্বেগ প্রকাশ করে। কারণ এই বন্দরের দখল নিয়ে ভারত মহাসাগরে সেনা আধিপত্যের প্রশ্নে চিন অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যায়।

তবে সম্পর্কের ভারসাম্য ভারত বেশ কিছুটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ২০২০ সালে। খুবই কাজে এসেছে ভারতের করোনা কূটনীতি। করোনা কালে পাঁচ লক্ষ প্রতিষেধকের জোগান দিয়ে ভারত যেভাবে অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা শ্রীলঙ্কার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা অবহেলা করা শ্রীলঙ্কার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো তার প্রতিদান দিয়েই সেপ্টেম্বর মাসে চিনকে এড়িয়ে শ্রীলঙ্কা ভারতের আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণের চুক্তিটি করেছে, যার বাজেট প্রায় ৫,২০০ কোটি টাকা। অক্টোবরে শ্রীলঙ্কার বিদেশসচিব জয়ন্ত কলম্বাগের আমন্ত্রণে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলেন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বৈঠক করেছেন প্রেসিডেন্ট গোতবায়া রাজাপক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে-র সঙ্গেও। বারো দিনের যৌথ সেনা মহড়াও সেরে নিয়েছে ভারত-শ্রীলঙ্কা। উদ্দেশ্য অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করা।

Unit 11: Relations with Myanmar and the Rohingya issue

মায়ানমার এবং ভারত সম্পর্ক:

মায়ানমার-এর (বার্মা) সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটি আলোচনার বা সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে ২০১৫ সালে যখন সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের রোহিঙ্গা-বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে সেনা সরকার লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানদের সেদেশে থেকে তাড়িয়ে দিতে থাকে। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের নীচে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এগিয়ে সরু যে এলাকাটি বঙ্গোপসাগরের কোলে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেই মায়ানমারের রাখাইন (আরাকান) প্রদেশ আর সেখান থেকেই ২০১৫-এ বিতাড়িত হয়েছে রোহিঙ্গারা। ভারত মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে এই কারণে যে, নির্বিচার রোহিঙ্গা হত্যা বা বিতাড়ন সত্ত্বেও তার সরকার মায়ানমারের সেনা-কর্তৃপক্ষের পাশেই থেকেছে বা শরণার্থী বিবেচনায় রোহিঙ্গাদের দেখভাল করেনি।

৮ই আগস্ট, ২০১৭ ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি advisory জারি করে যা সমস্ত রাজ্য সরকারকে "অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্তকরণ এবং নির্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত এবং বিলম্ব ছাড়াই শুরু করতে" দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলে। এই ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের কথা উল্লেখ না থাকলেও মায়ানমারের রিখাইন রাজ্য থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের কথা উল্লেখ ছিল ("infiltration from Rakhine state of Myanmar"), যারা এই advisory অনুযায়ী ভারতের ক্ষেত্রে বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারতো। 1 সেপ্টেম্বর, দুই রোহিঙ্গা ব্যক্তি, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের সহায়তায়, উপদেষ্টাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন দায়ের করেন এবং সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়টি তোলা হয়। 18 সেপ্টেম্বর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছিলেন যে সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে চলবে, এইভাবে রোহিঙ্গাদের নির্বাসিত করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্তটি বিচারকদের উপর নির্ভর করবে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিকূল অবস্থান অনেকাংশেই ধর্মীয় বৈরিতা দ্বারাও প্রভাবিত ছিল।

রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের সামরিক দমন-পীড়ন, যা 2016 সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং যেটিকে অনেক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ জাতিগত নির্মূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সম্প্রদায়ের প্রায় 380,000 সদস্য দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বাংলাদেশে আগত শরণার্থীদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ ও দুর্বল, আহত ও তরুণ, গর্ভবতী এবং ধর্ষিতা। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত স্যাটেলাইট চিত্রে কয়েক ডজন পুড়িয়ে দেওয়া গ্রাম দেখা যাচ্ছে। মায়ানমার সরকার প্রতিবাদ করে বলেছে, প্রায় অর্ধেক গ্রাম প্রভাবিত হয়নি—কিন্তু এর মানে আনুমানিক অর্ধেকই সহিংসতায় আক্রান্ত হয়েছে এবং কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে।

মায়ানমার বিশ্বের সামনে যুক্তি দিয়ে আসছে যে রোহিঙ্গারা বহুজাতিক দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করছে এবং তারা তাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর। এই ধরনের অবস্থান অবশ্য আন্তর্জাতিক স্তরে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বলা মুশকিল, কারণ জাতিসংঘের কর্মকর্তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আচরণকে বর্ণনা করতে "গণহত্যা" এবং "জাতিগত নির্মূল" এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য পর্যবেক্ষক যারা রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছেন তাদের মতে, অধিকাংশ রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রায় নেই বললেই চলে।

এই সংকট দেশটির রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতা, নোবেল শান্তি বিজয়ী অং সান সু চি-এর আদিম ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মিয়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সু চি অহিংস সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। তার দল, ন্যাশনাল লীগ ফর

ডেমোক্রেসি, 1990 সালে দেশের প্রথম অবাধ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর, সামরিক বাহিনী ফলাফল বাতিল করে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং শত শত এনএলডি সমর্থককে বন্দী করে এবং তাকে গৃহবন্দী করে। 2010 সালে তার মুক্তির পর থেকে, সু চি বিদেশ ভ্রমণ করছেন এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের আইকন হিসাবে পশ্চিমা দেশগুলিতে মানুষের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর থেকে সু চি আশ্চর্যজনকভাবে সদয় ভাষায় সেনাবাহিনীর কথা বলেছেন। অনেকেই আশা করেছিলেন যে সু চি রোহিঙ্গাদের পক্ষে কথা বলবেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা সু চির নীরবতাকে একটি ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে সেনাবাহিনী এখনও মিয়ানমারে ক্ষমতায় রয়েছে। তার সমর্থকরা দাবি করেন যে সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করলে সরকার সম্ভবত পতনও হতে পারে। কিন্তু সু চি'র নিজস্ব মতামত মিয়ানমারের প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় যে রোহিঙ্গারা বহিরাগত এবং তারা তাদের অন্তর্গত নয়।

২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মায়ানমারের রাজধানী নেপিতাওতে গেলে , যেখানে সু চি মায়ানমারে "সন্ত্রাসী হুমকি"র কথা উল্লেখ করেছিলেন। মোদি এক্ষেত্রে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং ব্যবসার সুযোগের কথা বললেও, সরাসরি রোহিঙ্গাদের কথা উল্লেখ করেননি। রাখাইনে চরমপন্থী সহিংসতায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও নিরীহ মানুষের প্রাণহানির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। কিন্তু ‘চরমপন্থী সহিংসতা’র জবাবে নিরস্ত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়নের প্রসঙ্গই তোলেননি।ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং অধিকাংশ জনমতের রোহিঙ্গাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব অনেকাংশে ভারতের শরণার্থীদের প্রতি যে মনোভাব সেক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিল।

মায়ানমারের সাথে ভারতের ভালো সম্পর্কের ফলে চীনের সাথে ভারতের সম্পর্কে কিছু প্রভাব পড়েছিল। তৎকালীন খবরে ভারতকে মায়ানমারে অস্ত্র প্রেরণকারী বলেও উল্লেখ করা হয়, তবে চীনের সাথে তুলনা করলে সেটা এমন কিছুইনা। এছাড়াও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সু চির সাথে মোদির বন্ধুত্ব বাংলাদেশকে বিরক্ত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশকে অনেকাংশেই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনেও বাংলাদেশের সহায়তা অনেকাংশে প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

২০১৯ এর মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি) ‘মিয়ানমারে মানবাধিকার পরিস্থিতি’ শিরোনামে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। তাতে অবশ্য ভোটদানে বিরত ছিল ভারত। বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) উদ্যোগে উত্থাপিত প্রস্তাবে মিয়ানমারে, বিশেষ করে রাখাইন, কাচিন ও শান প্রদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অব্যাহত ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এসব ব্যাপারে ইউএনএইচসিআরকে ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থায় পূর্ণ তদন্তের আহ্বান জানানো হয়।

পরে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে জাতিসংঘে (জেনেভায় ইউএনএইচসিআর কার্যালয়ে) নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাজীব কুমার চন্দর বলেন, আইন ও নীতিবিষয়ক পদক্ষেপের ব্যাপারে পরামর্শে সায় দেওয়া এবং মিয়ানমারকে শাস্তি দেওয়ার হুমকিতে (আইসিসিতে, মিয়ানমার যার স্বাক্ষরী নয়) সমর্থন জোগানো হিতে বিপরীত হবে।
ভারত রোম স্ট্যাটিউটে স্বাক্ষর করেনি। ফলে অন্য কোনো (মিয়ানমার) অ-স্বাক্ষরদাতা দেশে আইসিসির শাস্তিমূলক হস্তক্ষেপে সে আপত্তি জানানোর অধিকার রাখে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের অব্যাহত কূটনৈতিক ও নৈতিক উদাসীনতা লক্ষ্যণীয় এবং কিছু ক্ষেত্রে দুঃখজনকও। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ইউএন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন (ইউএন-এফএফএম) ও মানবাধিকারবিষয়ক আরো কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনের গণহত্যাসহ যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নেপিডোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক রক্ষার নামে ভারত দৃঢ় নৈতিক অবস্থান গ্রহণে নারাজ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের তালেই কথা বলে যাচ্ছে ভারত। রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক অধিকারের চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বেশি বলে; পরিস্থিতির আন্তর্জাতিক তদন্তের চেয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্তের কথা বলে। ইউএন-এফএফএমের অন্যতম সদস্য রাধিকা কুমারাস্বামী সম্প্রতি এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলি স্বীকার করা, সংশ্লিষ্ট লোকদের জবাবদিহির মধ্যে আনা এবং তাতমাদোর (মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী) সংস্কার সংকট কাটানোর একমাত্র পথ।

ভারত তাতমাদোর সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে, তাদের সামরিক সরঞ্জামাদি দিচ্ছে এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিপ্রি) নথি অনুসারে, ভারত মিয়ানমারের অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহক। ওলন্দাজ সংস্থা ‘স্তপ ভাপেনহান্দল’ (স্টপ আর্মস ট্রেড)-এর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে মিয়ানমারকে অস্ত্র দিচ্ছে ভারত।
ভারত বলতে চায়, তাতমাদোর আধুনিকায়ন, এক হাজার ৬৪০ কিলোমিটারেরও বেশি সীমান্তের সুরক্ষা এবং চীনের সীমান্ত বরাবর কৌশলগত মিত্রতা গঠন তার লক্ষ্য। কিন্তু এ যুক্তিতে মানবাধিকারবোধ খুবই কম। ভারতের সরবরাহ করা সামরিক সরঞ্জাম মিয়ানমার রাখাইন রাজ্য ও অন্যান্য এলাকার বেসামরিক ব্যক্তিদের নিধন বা দমন করার কাজে লাগাচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারতের মুখে রা নেই। ভারতের বিভিন্ন কম্পানি মিয়ানমারে বিনিয়োগও করছে; কিছু কম্পানি সরাসরি তাতমাদোর বাণিজ্যিক উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট।

মিয়ানমারকে চাপ দিতে নারাজ ভারত; বরং সে ঢাকা ও নেপিডোর সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে দুই দেশেই মানবিক ত্রাণ পাঠায়। ভারতের এমন নীতির ওপর বাংলাদেশের নজর বাড়ছে। বাংলাদেশ প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক ফোরামে অলক্ষে মিয়ানমারকে আনুকূল্য দিতে থাকলে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে আশ্রয়প্রার্থী কয়েক ডজন রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠাল।

ভূ-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করাতে মায়ানমারকে বাধ্য করতে পারত বা অন্তত এটা নিশ্চিত করতে যে এমন জঘন্য অপরাধ আর ঘটবে না। কিন্তু সে অং সান সু চিকে কোণঠাসা করতে চায় না, এমনিতেই জেনারেলদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয়। মায়ানমারের সঙ্গে তার সুবিধার বন্ধুত্ব। ফলে রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গারা নিপীড়নের শিকার হয়েই চলেছে।

কিন্তু ভারতের বাধ্যবাধকতার অন্য একটি বিচারও আছে। দীর্ঘকাল ধরেই নিরাপত্তার নিরিখে ভারত ও মায়ানমার একে অপরকে সহযোগিতা করে আসছে। ২০১০ সালে মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের একটি জরুরি নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার ফলে ভারতীয় সেনা জঙ্গিদের তাড়া করে মায়ানমার সীমান্তে ঢুকে যাওয়ার অনুমতি পায়। মণিপুর-নাগাল্যান্ড সংলগ্ন পশ্চিম মায়ানমারের সাগায়িং ডিভিশনে এমন অভিযান ভারতীয় সেনা চালিয়েছেও। তাছাড়া চিনকে ঠেকানোর বিষয়টি এক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। মায়ানমারে চিনের প্রবল ভূমিকার মোকাবিলা করাটাও ভারতের পক্ষে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে দরকার 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির' আড়ালে পাকিস্তান ও পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর অনুপ্রবেশ আটকানো। তবে একথা ঠিক যে গোটা রোহিঙ্গা সমাজের গায়ে 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা লাগিয়ে

তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সেনা-স্বৈরাচারীর পক্ষে দাঁড়ানো কোনও জাতি-রাষ্ট্রের পক্ষেই সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা নয়। এতে রাষ্ট্রবিরোধী একটা গণপ্রতিরোধের সূচনা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অলোক কুমার ঘোষ
প্রণব কুমার চ্যাটার্জি
Salil Tripathi, The Reluctant Philanthropist, The Caravan
https://caravanmagazine-in.translate.goog/perspectives/india-untenable-position-rohingya-crisis?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc
অংশুমান চৌধুরী, রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের ভূমিকা, কালের কণ্ঠ
https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2019/05/31/775277

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.অলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০১২, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক,২০১২।
2.প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, হাওড়া: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১|
3.Srikant Dutt, India and the Third World: Altruism or Hegemony?, Zed Books, 1984

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

1. Write a critical note on India-Nepal and India-Bhutan relationship.
2. What do you know about Non Alignment Movement?
3. Write an essay on Third World Organizations in post-independent era.
4. Critically discuss the India-Myanmar relationship.

Block 5

Changing Relationship between India and Afghanistan

Unit 12, 13, 14

Unit 12: Era of Russian Intervention

Unit 13: American reaction and emergence of the Taliban in 1990s

Unit 14: The anti-American state of the Taliban-Al Qaeda link and the second phase of Talibanism

উদ্দেশ্য

সূচনা

পূর্ব প্রেক্ষাপট

ডিসেম্বর, ১৯৭৯-ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

মার্চ ১৯৮০-এপ্রিল ১৯৮৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসন

২. মার্কিন আফগান সম্পর্ক, তালিবানের উত্থান

৩. মার্কিন সৈন্য অপসারণ এবং তালিবান শাসনের দ্বিতীয় পর্ব

Unit 12: Era of Russian Intervention

সূচনা

সোভিয়েত–আফগান যুদ্ধ ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং আফগান মুজাহিদদের মধ্যে সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকারের হস্তক্ষেপ এবং মদতেই সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই যুদ্ধ একপ্রকার ছিল সোভিয়েত রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট বিরোধী মুসলিম গেরিলা বাহিনীর মধ্যে। ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আর ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তান থেকে সর্বশেষ সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে প্রায় ৬ থেকে ২০ লক্ষ আফগান প্রাণ হারায়, যাদের অধিকাংশই ছিল বেসামরিক নাগরিক।

সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবেশের আগে ১৯৭৮ সালে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ আফগানিস্তান ক্ষমতায় আসে এবং নূর মুহম্মদ তারাকী রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। দলটি দেশজুড়ে প্রচলিত ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করে কার্ল মার্কস এর কমিউনিজম আগ্রাসনের সূচনা করে, যা বলাবাহুল্য সাধারণ মানুষের ধর্মীয় মানসিকতায় আঘাত হেনেছিল। আফগান সরকার কঠোরভাবে বিরোধিতা দমন করে, হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় ২৭,০০০ রাজনৈতিক বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেকগুলো সরকারবিরোধী সশস্ত্র দল গঠিত হয় এবং ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে আফগানিস্তানের বড় একটি অংশ জুড়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

আফগান কমিউনিস্ট শাসন অনেকাংশেই ত্রুটিপূর্ণ থাকায় এবং এর দ্বারা কমিউনিজম এর স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ন না হওয়ায় আফগানিস্তানে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর লিওনিদ ব্রেজনেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার আফগানিস্তানে আক্রমণ করেন। রাজধানী কাবুলে পৌঁছানোর পর সোভিয়েত সৈন্যরা রাষ্ট্রপতি আমিনকে হত্যা করে এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের সদস্য সোভিয়েতপন্থী বাবরাক কারমালকে ক্ষমতায় বসায়।

সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তানের শহর ও যোগাযোগ কেন্দ্রগুলো দখল করে, অন্যদিকে মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানের যে ৮০ শতাংশ ভূমি আফগান সরকার ও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল সেসব অংশে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে। সোভিয়েতরা আফগান বিদ্রোহী ও বেসামরিক জনগণকে কঠোরভাবে

মোকাবেলা করার জন্য বিমানশক্তি ব্যবহার করে, মুজাহিদিনদের নিরাপদ আশ্রয় লাভের সুযোগ না দেয়ার উদ্দেশ্য গ্রামের পর গ্রাম মাটিতে মিশিয়ে দেয়, সেচ খালগুলো ধ্বংস করে এবং লক্ষ লক্ষ ভূমি মাইন ছড়িয়ে দেয়।

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যসংখ্যা ১,০৮,০০০-এ বর্ধিত করা হয় এবং দেশব্যাপী সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝিতে সংস্কারপন্থী নেতা মিখাইল গর্বাচেভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত সরকার আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। ১৯৮৮ সালের ১৫ মে আফগানিস্তান থেকে চূড়ান্তভাবে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার আরম্ভ হয় এবং ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়।

পূর্ব প্রেক্ষাপট:

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাদশাহ মুহম্মদ জহির শাহ আফগানিস্তান শাসন করেন। তার চাচাতো ভাই লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহম্মদ দাউদ খান ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এসময় মার্ক্সবাদী পিডিপিএ-এর শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭ সালে পিডিপিএ নূর মুহম্মদ তারাকী ও হাফিজুল্লাহ আমিনের নেতৃত্বাধীন খালক (জনতা) এবং বাবরাক কারমালের নেতৃত্বাধীন পারচাম (পতাকা) নামক দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

জহির শাহের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টির অভিযোগ উঠলে ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দাউদ এই সুযোগে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। দাউদ আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান এবং তার শাসন আফগান জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু পিডিপিএ-এর সমর্থকদের নিতট দাউদের শাসন জনপ্রিয় ছিল না।

দাউদের সরকার কর্তৃক পিডিপিএ সদস্যদের ওপর চালানো নিপীড়ন এবং পিডিপিএ-এর একজন প্রথম সারির নেতা মীর আকবর খাইবারের রহস্যজনক মৃত্যু পিডিপিএ-র উভয় উপদলকে দাউদের সরকারের চরম বিরোধী করে তোলে। খাইবারে রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার পর কাবুলে দাউদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর ফলে আফগান কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকজন পিডিপিএ নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল পিডিপিএ-এর প্রতি সহানুভূতিশীল আফগান সেনাবাহিনীর সদস্যরা দাউদের সরকারকে উৎখাত করে এবং দাউদ সপরিবারে নিহত হন। পিডিপিএ-এর মহাসচিব নূর মুহম্মদ তারাকী নবগঠিত আফগানিস্তান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিপ্লবের পর তারাকী আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী এবং পিডিপিএ-এর মহাসচিব পদে আসীন হন। আফগান সরকার রাষ্ট্রপ্রধান তারাকী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিনের নেতৃত্বে 'খালক' এবং বাবরাক কারমাল ও মুহম্মদ নাজিবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন 'পারচাম' এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পিডিপিএ-র এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পারচাম উপদলের সদস্যদের কেউ কেউ নির্বাসিত হন, কেউ কেউ দল থেকে বহিষ্কৃত হন এবং কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়।
পিডিপিএ-এর শাসনকালের প্রথম ১৮ মাসে আফগান সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে একটি আধুনিকায়ন ও সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেগুলোর বেশিরভাগই আফগান রক্ষণশীলরা ইসলামবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করেন। বিবাহ প্রথার পরিবর্তন এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত অধ্যাদেশগুলো কট্টর ইসলামপন্থী আফগান জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি, এবং সুদপ্রথা নিষিদ্ধকরণ ও কৃষকদের ঋণ বাতিল করায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

ক্ষমতাশালী জমিদাররাও সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট হয়। নতুন সরকার কর্তৃক নারীদের অধিকার বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা, এবং আফগানিস্তানের জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার প্রদান প্রমুখ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলস্বরূপ কট্টর ধর্মপ্রাণ সাধারণ জনগণ এর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তবে এইসব প্রকল্পের ফলাফল কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করা হয়। ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়। পূর্ব আফগানিস্তানের নূরিস্তান প্রদেশে বিদ্রোহীরা স্থানীয় সেনানিবাস আক্রমণ করে এবং শীঘ্রই সমগ্র দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে উপ-প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিন রাষ্ট্রপ্রধান তারাকীকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করেন এবং শাসনক্ষমতা দখল করেন। আমিন পিডিপিএ-র অভ্যন্তরে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের এবং ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমনের চেষ্টা চালান, যার ফলে তার শাসনামলে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য তীব্রতর হয়ে ওঠে।

১৯৭৯ সালের ৩১ অক্টোবর আফগান সশস্ত্রবাহিনীতে নিযুক্ত সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টারা সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের নির্দেশে আফগান সৈন্যদের তাদের ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামকে রক্ষণাবেক্ষণ চক্রের আওতায় আনার জন্য তথ্য প্রদান করেন। একই সময়ে কাবুলের বাইরের অঞ্চলগুলোর সঙ্গে শহরটির টেলিযোগাযোগ ছিন্ন করে শহরটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হওয়া নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে আফগানিস্তানে বিদ্যমান সোভিয়েত স্থলসেনাদের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক প্যারাট্রুপার যোগদান করে এবং ২৫ ডিসেম্বর কাবুলে অবতরণ করে। একই সময়ে আমিন রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যালয় তাজবেগ প্রাসাদে সরিয়ে নেন। তার ধারণা ছিল এই স্থানটি বিভিন্ন হুমকি থেকে অধিকতর নিরাপদ। আফগানিস্তানে প্রেরিত সোভিয়েত ৪০তম আর্মির প্রথম কমান্ডার কর্নেল-জেনারেল ইউরি তুখারিনভের বক্তব্য অনুযায়ী, আমিন সর্বশেষ ১৭ ডিসেম্বর উত্তর আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। দেশটিতে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের পূর্বে আমিনের ভাই এবং জেনারেল দিমিত্রি চিয়াঙ্গভ সোভিয়েত ৪০তম আর্মির কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সোভিয়েত সৈন্যদের প্রাথমিক গতিপথ ও মোতায়েনস্থল নির্ধারণ করেন| ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর কেজিবি এবং গ্রু-র বিশেষ বাহিনী *আলফা গ্রুপ* ও *জেনিথ গ্রুপের* কর্মকর্তাসহ ৭০০ সোভিয়েত সৈন্য কাবুলের প্রধান প্রধান সরকারি, সামরিক ও প্রচারমাধ্যমের ভবনগুলো দখল করে নেয়।

সেদিন সন্ধ্যা ৭:০০টায় কেজিবি-পরিচালিদ সোভিয়েত *জেনিথ গ্রুপ* কাবুলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয় এবং এর মাধ্যমে আফগান সামরিক কমান্ডকে অকেজো করে দেয়। ৭:১৫ তে তাজবেগ প্রাসাদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক আফগান রাষ্ট্রপ্রধান হাফিজুল্লাহ আমিনকে হত্যা করে। একই সঙ্গে কাবুলের আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু দখল করে নেয়া হয়। ১৯৭৯ সালের ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে অভিযানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

উজবেক প্রজাতন্ত্রের তেরমেজ থেকে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ রেডিও কাবুলে ঘোষণা করেন যে, আফগানিস্তান আমিনের "দু:শাসন" থেকে মুক্ত হয়েছে। সোভিয়েত পলিটব্যুরোর বক্তব্য অনুযায়ী, তারা ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত *বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং ভালো প্রতিবেশীসুলভ আচরণ* সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী চলছেন, আফগান বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি আমিনকে "তাঁর অপরাধসমূহের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে"এবং এরপর উক্ত কমিটি সরকারপ্রধান হিসেবে প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী বাবরাক কারমালকে নির্বাচিত করেছে (খালক কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর তাঁকে চেকোস্লোভাকিয়ায় রাষ্ট্রদূতের গুরুত্বহীন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল)। তাঁরা আরও ঘোষণা করেন যে, নতুন আফগান সরকার সোভিয়েত সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করেছে।

২৭ ডিসেম্বর মার্শাল সের্গেই সকোলভের নেতৃত্ব সোভিয়েত স্থলসেনারা উত্তর দিক থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। সকালে বাগরাম বিমানঘাঁটিতে সোভিয়েত ১০৩তম রক্ষী 'ভিতেবস্ক' এয়ানবোর্ন ডিভিশন অবতরণ করে এবং

আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন আরম্ভ হয়। আফগানিস্তানে প্রবেশকারী সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী (১০৩তম রক্ষী এয়ারবোর্ন ডিভিশনসহ) ৪০তম আর্মির অধীন ছিল এবং সোভিয়েত ১০৮তম ও ৫ম রক্ষী মোটর রাইফেল ডিভিশন, ৮৬০তম পৃথক মোটর রাইফেল রেজিমেন্ট, ৫৬তম পৃথক এয়ারবোর্ন অ্যাসল্ট ব্রিগেড, এবং ৩৬তম মিশ্র এয়ার কোরের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও কিছু ক্ষুদ্র ইউনিটের সঙ্গে সোভিয়েত ২০১তম এবং ৫৮তম মোটর রাইফেল ডিভিশনও দেশটিতে প্রবেশ করে। আফগানিস্তানে প্রবেশকারী সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীতে প্রাথমিকভাবে ৮০,০০০ সৈন্য, প্রায় ১,৮০০টি ট্যাঙ্ক এবং প্রায় ২,০০০টি এএফভি ছিল। কেবল দ্বিতীয় সপ্তাহেই সোভিয়েত বিমানগুলো কাবুলে সর্বমোট ৪,০০০টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছিল। পরবর্তীতে আরও দুই ডিভিশন সোভিয়েত সৈন্য আগমনের পর মোট সৈন্যসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১,০০,০০০-এর বেশি।

ডিসেম্বর, ১৯৭৯-ফেব্রুয়ারি ১৯৮০:

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত সৈন্যরা বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা স্থলপথ ও আকাশপথে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে দ্রুত দেশটির প্রধান প্রধান শহর, সামরিক ঘাঁটি এবং কৌশলগত স্থাপনাগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যদের উপস্থিতির ফলে দেশটির পরিস্থিতি আশানুরূপ স্থিতিশীল হয় নি। বরং এটি আফগানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি করে এবং ফলে বিদ্রোহের মাত্রা আরও বিস্তৃত হয়। আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান বাবরাক কারমাল সোভিয়েতদেরকে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন এবং ৪০তম আর্মিকে সরাসরিভাবে বিদ্রোহ দমনে অংশ নেয়ার জন্য দাবি জানান, কারণ তার নিজের সেনাবাহিনী বিশ্বাসের অযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছিল। এভাবে সোভিয়েত সৈন্যরা আবিষ্কার করে যে, তাদেরকে শহুরে বিদ্রোহ, উপজাতীয় সৈন্যদলসমুহ ("লস্কর" নামে পরিচিত) এবং কখনো কখনো আফগান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অবশ্য এসব বাহিনী প্রধানত খোলা স্থানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যার ফলে সোভিয়েত যুদ্ধবিমান ও কামানগুলো তাদের দমন করার কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয়।

১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারি কান্দাহারের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে এবং সেখানে অবস্থানরত সোভিয়েত সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করে। ১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কাবুলের জনসাধারণ সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলের ওপর সোভিয়েত সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করলে শত শত আফগান নিহত হয় এবং কয়েক হাজার আফগানকে গ্রেপ্তার করা হয় (গ্রেপ্তারকৃতদের পরবর্তীতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়)। একই দিন শিনদান্দে সোভিয়েতবিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা দাঙ্গাটি দমন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মার্চ ১৯৮০-এপ্রিল ১৯৮৫:

যুদ্ধটি ক্রমে একটি নতুন রূপ ধারণ করে: সোভিয়েতরা আফগানিস্তানের শহর ও প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্রগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর বিদ্রোহী মুজাহিদরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দেশটির প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমি সরকারের হাতছাড়া হয়ে যায়। সোভিয়েত সৈন্যদের উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানে, বিশেষত তেরমেজ থেকে কাবুল পর্যন্ত রাস্তা বরাবর মোতায়েন করা হয়। ইরানের প্রভাব প্রতিহত করার জন্য পশ্চিম আফগানিস্তানে একটি শক্তিশালী সোভিয়েত সৈন্যদল মোতায়েন রাখা হয়। কখনো কখনো সোভিয়েত স্পেৎসনাজ সৈন্যরা সেখান থেকে ইরানের অভ্যন্তরে মুজাহিদ ঘাঁটিগুলোর ওপর গুপ্ত আক্রমণ চালায় এবং সোভিয়েত হেলিকপ্টারগুলো ইরানি বিমানবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের নূরিস্তান এবং মধ্য

আফগানিস্তানের পার্বত্য হাজারাজাত অঞ্চলসহ বেশকিছু অঞ্চলে সোভিয়েত সৈন্যদের কোনো উপস্থিতি ছিল না এবং যুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে এসব অঞ্চল প্রায় স্বাধীন অবস্থায় থাকে।

কখনো কখনো সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী মুজাহিদ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে কয়েক ডিভিশন সৈন্যসহ আক্রমণ চালায়। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যরা কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জশির উপত্যকায় ৯টি আক্রমণ চালায়, কিন্তু অঞ্চলটিতে আফগান সরকারের পূর্ণ বা স্থায়ী কর্তৃত্ব কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতেও তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব প্রদেশের শহর ও সরকারি বাহিনীর ঘাঁটিগুলো প্রায়ই মুজাহিদদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত। সোভিয়েতরা নিয়মিতভাবে বড়মাত্রার অভিযান চালিয়ে এসব অবরোধ ভেঙে ফেলত, কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার পরপরই মুজাহিদরা ফিরে আসত। পশ্চিম ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে যুদ্ধ হয় অনেকটা বিক্ষিপ্তভাবে এবং সীমিত মাত্রায়, ব্যতিক্রম ছিল হেরাত ও কান্দাহার, যে প্রদেশগুলোর অংশবিশেষ সবসময়ই মুজাহিদদের দখলে থাকত।

যুদ্ধের প্রথমদিকে সোভিয়েতরা আফগান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এমন সক্রিয়ভাবে তাদেরকে অংশ নিতে হবে এ ধারণা করে নি। এজন্য তারা আফগান সেনাবাহিনীকে সীমিত সমর্থন প্রদানের মধ্যে যুদ্ধে তাদের ভূমিকা সীমিত রাখার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সোভিয়েত হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হয় কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সম্পূর্ণ উল্টো। সোভিয়েত সৈন্যদের উপস্থিতি আফগান জনসাধারণকে শান্ত করার পরিবর্তে মুজাহিদদের শক্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েতরা ধারণা করেছিল যে তাদের সৈন্যদের উপস্থিতি আফগান সেনাবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং বড় বড় শহর, যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাদের সহযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু আফগান সামরিক বাহিনীতে সৈন্যদের দলত্যাগের হার ছিল খুবই বেশি এবং বিশেষত যখন সোভিয়েত সৈন্যরা সাঁজোয়া যান ও গোলন্দাজ বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে তাদের ওপর পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় তখন থেকেই তারা যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল না। তবে আফগান সৈন্যদের এতটা অকর্মণ্যতার মূল কারণ ছিল যে, তারা মনোবলহীন হয়ে পড়েছিল, কেননা বস্তুত তাদের অনেকেই আফগান কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত ছিল না বরং কেবল বেতন সংগ্রহ করছিল। যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে সোভিয়েতদের নিজেদেরকেই যুদ্ধের গুরুভার কাঁধে নিতে হবে, তখন তারা বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনটি প্রধান কৌশল অবলম্বন করে। প্রথম কৌশলটি ছিল ভীতিপ্রদর্শন। সোভিয়েতরা গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সেখানকার গ্রাম, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করে দেয়। যেসব স্থানে সোভিয়েত সৈন্যবহরগুলোর ওপর গেরিলা হামলা হত অথবা যেসব স্থানের জনসাধারণ মুজাহিদ দলগুলোকে সহযোগিতা করত, সেসব স্থানের গ্রামগুলোর ওপর সোভিয়েতরা বোমাবর্ষণ করত। এসব অঞ্চলে নিয়মিত সোভিয়েত আক্রমণের ফলে সেখানে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং স্থানীয় জনসাধারণ হয় মৃত্যুবরণ করে নয়ত বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এসব অঞ্চলকে জনশূন্য করার মাধ্যমে সোভিয়েতরা গেরিলাদেরকে তাদের রসদপত্র ও নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করতে চাইছিল। দ্বিতীয় কৌশলটি ছিল অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা। এজন্য সোভিয়েতরা মুজাহিদ দলগুলোতে যোগদানের জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করে এবং স্থানীয় উপজাতি অথবা গেরিলা নেতাদের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য উৎকোচ প্রদান করে। তৃতীয় কৌশলটি ছিল গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে সাঁড়াশি অভিযান চালানোর মাধ্যমে গেরিলাদের উচ্ছেদ করা। এজন্য সোভিয়েতরা ব্যাপকভাবে মিল এমআই-২৪ হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করে যেগুলো সাঁজোয়া যানগুলোর অভ্যন্তরে থাকা সোভিয়েত সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। কখনো কোনো গ্রাম দখল করার পরপরই সোভিয়েত সৈন্যরা সেখানে থেকে যাওয়া অধিবাসীদের বন্দি করে তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করত অথবা মেরে ফেলত।

বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের 'পাশবিক শক্তি প্রয়োগে'র নীতি কার্যকর করতে সোভিয়েতরা আফগান গোয়েন্দা পুলিশ সংস্থা কেএইচএডি-কে কাজে লাগায়। তথ্য সংগ্রহ, মুজাহিদ দলগুলোতে অনুপ্রবেশ, ভুয়া তথ্য ছড়ানো, উপজাতীয় মিলিশিয়াগুলোকে আফগান সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য উৎকোচ প্রদান এবং একটি সরকারি মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের জন্য সোভিয়েতরা কেএইচএডি-কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যদিও কেএইচএডি মুজাহিদ দলগুলোতে অনুপ্রবেশ করতে কতটা সক্ষম হয়েছিল সেটা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়, তবুও ধারণা করা হয় যে, তারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানভিত্তিক বেশ কয়েকটি মুজাহিদ দলে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। মুজাহিদ দলগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টিতে কেএইচএডি বিশেষভাবে সফল হয়েছিল, যার ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কিছু মুজাহিদ দল সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে। বিভিন্ন উপজাতির আনুগত্য অর্জনের ক্ষেত্রেও কেএইচএডি কিছুটা সাফল্য অর্জন করে, কিন্তু এসব সম্পর্কের অনেকগুলোই ছিল কৃত্রিম ও সাময়িক। কেএইচএডি প্রায়শই উপজাতিগুলোর স্থায়ী রাজনৈতিক আনুগত্য আদায়ের পরিবর্তে তাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। কেএইচএডি-নিয়ন্ত্রিত সারান্দোয় নামক সরকারি মিলিশিয়া বাহিনী যুদ্ধে মিশ্র সাফল্য অর্জন করে। বেশি বেতন ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করায় অনেকেই কমিউনিস্টপন্থী না হয়েও এই বাহিনীটিতে যোগ দিতে আগ্রহী হয়। কিন্তু সমস্যার বিষয় ছিল যে, যোগদানকারীদের অনেকেই ছিল অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ সংগ্রহে আগ্রহী প্রকৃতপক্ষে মুজাহিদ দলগুলোর সদস্য এবং আসন্ন সামরিক অভিযানগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৮৫ সালে আফগানিস্তানে মোতায়েনকৃত সোভিয়েত সৈন্যসংখ্যা ১,০৮,০০০-এ উন্নীত হয় এবং দেশব্যাপী যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ১৯৮৫ সালই ছিল আফগান যুদ্ধের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী বছর। কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদরা পরাজিত হয় নি, কারণ প্রতিদিনই হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিল। ফলে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

Unit 13: American reaction and emergence of the Taliban in 1990s

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্থানে সোভিয়েত রাশিয়া সামরিক হস্তক্ষেপ করে এবং বারবাক কামালের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার ক্ষমতাসীন হয়। বারবাক কামাল তাঁর সাত বছর শাসনকালে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ আফগানকে হত্যা করেন। এদিকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের শেষে পাকিস্তানে দশ লক্ষ এই আফগান শরণার্থী আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়ে
আফগান সেনারা মুজাহিদিন বাহিনী গঠন করে এবং পেশোয়ারে মুজাহিদিনদের সদর দপ্তর স্থাপিত হল।

এর পাশাপাশি সোভিয়েত আক্রমণের পর ৩৪টি মুসলিমপ্রধান দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং অবিলম্বে ও নি:শর্তভাবে মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১০৪–১৮ ভোটে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ৬৫টি দেশ আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ১৯৮০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিতব্য গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস বয়কট করে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানী গিলেস কেপেলের মতে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ বা 'আক্রমণ'কে পশ্চিমা বিশ্বে

"আতঙ্কের সঙ্গে দেখা হয়" এবং তারা এটিকে ভূরাজনীতিতে একটি "স্পষ্ট পরিবর্তন" হিসেবে বিবেচনা করে, যেটির মাধ্যমে ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনে স্বীকৃত ক্ষমতার ভারসাম্যের লঙ্ঘন ঘটেছে বলে তারা মনে করতে থাকে।
বেশ কয়েকটি দেশের মাধ্যমে আফগান মুজাহিদদের অস্ত্র সরবরাহ আরম্ভ হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল কর্তৃক আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে দখলকৃত সকল সোভিয়েত অস্ত্র ক্রয় করে মুজাহিদদের নিকট প্রেরণ করে, মিশর নিজস্ব সেনাবাহিনীর জন্য নতুন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে পুরাতন অস্ত্রগুলো মুজাহিদদের কাছে পাঠিয়ে দেয়, তুরস্ক তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের অস্ত্রভাণ্ডার মুজাহিদদের প্রেরণ করে, আর যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ড যথাক্রমে ব্লোপাইপ ক্ষেপণাস্ত্র ও ওরেলিকন বিমান-বিধ্বংসী কামান তাদের সেনাবাহিনীর জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বিবেচিত হওয়ায় সেগুলো মুজাহিদদের সরবরাহ করে। চীনও গেরিলাযুদ্ধে তাদের নিজস্ব বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অনুসারে তাদের সবচেয়ে প্রচলিত অস্ত্রগুলো মুজাহিদদের সরবরাহ করে এবং সবগুলো সরবরাহের সূক্ষ্ম হিসাব সংরক্ষণ করে।
১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, মিশর, চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট আফগান মুজাহিদরা মস্কোর সামরিক ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান যুদ্ধকে ঠান্ডা লড়াইয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ অপারেশন সাইক্লোন নামক একটি কর্মসূচিতে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সোভিয়েতবিরোধী যোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান করে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়। প্রদেশটির দেওবন্দি উলেমা আফগান জিহাদে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মাদ্রাসা হাক্কানিয়া সোভিয়েতবিরোধী আফগান যোদ্ধাদের জন্য একটি প্রধান সাংগঠনিক ও যোগাযোগ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। মুসলিম দেশগুলো আফগান মুজাহিদদের অর্থের পাশাপাশি হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা সরবরাহ করে, যারা "নাস্তিক" কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে "জিহাদ" করতে আগ্রহী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সৌদি তরুণ ওসামা বিন লাদেন, যাঁর আরব দল পরবর্তীতে আল কায়েদায় পরিণত হয়।

আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সৃষ্টি হয়েছিল নৈরাজ্যের মধ্যে এবং তাদের বিস্তার ও সাফল্য অর্জন হয়েছিল নৈরাজ্যের মধ্যে। এজন্য তারা অন্য কোনোভাবে শাসন করার পথ খুঁজে পায় নি। আফগান যুদ্ধের প্রায় পুরোটাই পরিচালিত হয়েছিল আঞ্চলিক যুদ্ধপ্রবন নেতাদের দ্বারা। যুদ্ধ নিয়মিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদদের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন ও তাদের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়তে থাকে। তবে তা সত্ত্বেও মুজাহিদদের সংগঠনের মূল ইউনিটসমূহ ও তাদের কার্যক্রম আফগান সমাজের ব্যাপক বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিরই প্রতিফলন ঘটায়।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য অপসারণ শুরু করে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘও সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের ৮১ পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে (নভেম্বর, ১৯৮৭ খ্রি.)। ১৯৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দে সেনা প্রত্যাহার করা হয়। এরপর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে জেনেভায় মুজাহিদিনদের সঙ্গে আফগান সরকার আলাপ-আলোচনায় বসেন। এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদ্রোহীদের সামরিক সাহায্যদানের পরিমাণ হ্রাস করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে নজিবুল্লা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। এরপর মুজাহিদিনদের বিভিন্ন হয়েও গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের জন্য পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুজাহিদিনদের মধ্যে তালিবান গোষ্ঠী বেশি প্রভাবশালী হতে থাকে এবং তারা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করে নজিবুল্লাকে হত্যা করে। ঐ বছরে ডিসেম্বরে তালিবান জঙ্গীরা যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনায় বসতে রাজী হয়। এদিকে তালিবান গোষ্ঠী আফগানিস্থানে উগ্র ইসলামীয় বিধান জারী করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আবদুল

মালিক ও আবদুল রশিদ দস্তাম প্রমুখ প্রতিপক্ষ সেনানায়কগণ একত্রে তালিবানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও (অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রি.) দীর্ঘদিন পরিস্থিতি অশান্ত ও অনিশ্চিত রয়ে যায়।

আফগানিস্তান ভারতের পক্ষে প্রতিরোধক রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল ১৯৯০ সালের দশকে, সেখানকার তালিবান আমলে। আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত অনুপ্রবেশের পর ভারত সেই অনুপ্রবেশের সমালোচনা করতে পারেনি, এক দশক আগের রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি তার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতের অপসারণ ও ১৯৯০ সালে তার ভাঙ্গনের পর মার্কিনি ও পাকিস্তানি মদতে আফগান-তালিবান শাসকরা ছিল তীব্র ভারত-বিরোধী এবং সন্ত্রাস-সমর্থক। ভারতের পক্ষে সময়টা সুখকর ছিল না, স্বস্তির তো নয়ই।

অবস্থার বদল ঘটে ২০০১ সালের পর। ইতিমধ্যে তালিবানরা 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' ওসামা বিন লাদেনের সংস্পর্শে মার্কিন-বিরোধী হয়ে ওঠে এবং মার্কিন হামলায় ক্ষমতাচ্যুত হয়। পাখতুন নেতা আমেরিকা-প্রিয় হামিদ কারজাই হন নতুন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ভারত-মার্কিন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের হাওয়ায় এই ঘটনা ছিল ভারতের পক্ষে স্বস্তিদায়ক। তাই ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ভারত যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ৫০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য দিয়েছে, ভারতের প্রযুক্তিবিদরাও দলে দলে আফগানিস্তানে গিয়ে সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন, ২০০৫ সালে হামিদ কারজাই ভারত সফরে এসেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সেখানে গেছেন তার ছ'মাস পরে; ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধির আফগান সফরের চারদশক পর ছিল তাঁর এই আফগান যাত্রা।

ভারতের এই আফগান নীতির তিনটি প্রধান গুরুত্ব ছিল। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর মধ্য এশিয়ার স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় আফগানিস্তান একটি বড় ভূমিকা নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইরান থেকে ভারত জ্বালানি সরবরাহ প্রকল্পে আফগানিস্তান হয়ে উঠতে পারে সহায়ক দেশ এবং তৃতীয়ত, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আফগানিস্তানের সহযোগিতা ভারতের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়।

কিন্তু আফগানিস্তান থেকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নির্মূল হয়েছিল, তা নয়। ২০০১ সালে প্রথম পর্বের তালিবান জমানার অবসানের পরেও এই চত্বর সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারেনি। রাজধানী কাবুল তো বটেই, প্রায়শই জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত হয় বিভিন্ন শহর, আক্রান্ত হন ভারতীয় কর্মী-প্রযুক্তিবিদ, অন্যরাও বাদ যান না। আফগান প্রেসিডেন্ট ৩৬৬ হামিদ কারজাইয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়ায় এসে অবস্থা সামলাতে চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, কিন্তু পারেননি এবং ২০০৭ সালেই আট হাজার মানুষের প্রাণ গেছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান-কি-মুন ২০০৮ সালের মার্চে এক রিপোর্টে লিখেছেন, "The Taliban and related armed groups and the drug economy represent fundamental threats to still fragile political, economic and social institutions...Despite tactical successes by national and international military forces, the anti-government elements are far from defeated", এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অসুবিধে হয়েছে ভারতের। পাকিস্তানের আফগানিস্তান ঘেঁষা এলাকায় তালিবান ঘাঁটি এখনও রয়ে গেছে। ভারত-বিরোধিতা ও সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় সেখানে মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। আর এই প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানা পড়েন।

Unit 14: The anti-American state of the Taliban-Al Qaeda link and the second phase of Talibanism

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চল তালেবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তারা সেখানে ইসলামি আইন (শরিয়ত) প্রণয়ন করেছিলো। ১৯৯৪ সালে আফগান গৃহযুদ্ধের অন্যতম প্রধান দল হিসেবে তালেবানের আবির্ভাব ঘটে। এই দলটি মূলত পূর্ব ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের পশতুন এলাকার ছাত্রদের (তালিব) নিয়ে গঠিত হয় যারা ঐতিহ্যবাহী ইসলামি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলো এবং সোভিয়েত–আফগান যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছিলো। মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে, এই আন্দোলন আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তান ইসলামি আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আফগান রাজধানী কান্দাহারে স্থানান্তরিত হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর ২০০১ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আক্রমণের পর ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত দেশের বেশিরভাগ অংশ তালিবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলো মাত্র তিনটি দেশ: পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। পরে এই দলটি আফগানিস্তান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কারজাই প্রশাসন এবং ন্যাটো নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনীর (আইএসএএফ) বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি বিদ্রোহ আন্দোলন হিসেবে পুনরায় একত্রিত হয়।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আফগান সরকার ব্যাপকভাবে অভিযোগ করে, তালেবানের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায় থাকাকালীন পাকিস্তান ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স ও সামরিক বাহিনী তাদের সহায়তা প্রদান করেছে এবং বিদ্রোহের সময় তালেবানদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। পাকিস্তান জানায়, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর তারা এই দলকে আর সমর্থন করছে না। জানা যায়, ২০০১ সালে আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের অধীনে থাকা ২,৫০০ আরব তালেবানের পক্ষে যুদ্ধ করে।

সোভিয়েত-সমর্থিত সরকারের পতনের পর 1992 সালের এপ্রিলে ক্ষমতায় আসা নতুন ইসলামিক প্রশাসনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাগত জানায়। এর পর, মুজাহিদিনের দলগুলো যারা জয়ী হয়, তারা নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু করে , কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ সে সময় আফগানিস্তানের দিকে ছিল।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের মতো, এটি তালেবান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন উগ্র ইসলামপন্থী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এবং দেশের বৈধ সরকার হিসাবে উত্তর জোট এর প্রতি (আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানের মুক্তির **জন্য ইউনাইটেড ইসলামিক ন্যাশনাল ফ্রন্ট** নামে পরিচিত) সমর্থন অব্যাহত রাখে। মার্কিন সরকারের তালেবানদের সাথে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ছিল, কিন্তু ওসামা বিন লাদেনের ফতোয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং 1998 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে বোমা হামলার পর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। অপারেশন ইনফিনিট রিচের পর , মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটি টেলিফোন কল করে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পদত্যাগের দাবি জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবান সরকারকে সাহায্য বা স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে যদি না এটি বিন লাদেনকে বহিষ্কার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 11 সেপ্টেম্বরের হামলার পর , ওসামা বিন লাদেন সেই সময়ে আশ্রয়ের অধীনে আফগানিস্তানে বসবাসকারী ওসামা বিন লাদেন দ্বারা সংঘটিত বলে মনে করা হয়, মার্কিন নেতৃত্বাধীন অপারেশন এন্ডুরিং ফ্রিডম চালু

করা হয়েছিল। এই বড় সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল তালেবান সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা এবং ওসামা বিন লাদেন সহ আল কায়েদা সদস্যদের ধরা বা হত্যা করা। তালেবানদের উৎখাতের পর , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তালেবান বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উচ্চ স্তরের সৈন্য বজায় রেখে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের নতুন সরকারকে সমর্থন করেছিল। আফগানিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই 2001 সালের শেষের দিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় শুরু করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের সামগ্রিক পুনর্গঠনে আফগানিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে বিলিয়ন ডলার প্রদান করে , জাতীয় রাস্তা, সরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। 2005 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তান একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে যা উভয় দেশকে একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দেয়। 1 মার্চ 2006-এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার স্ত্রী লরার সাথে আফগানিস্তান সফর করেন যেখানে তারা আমেরিকান সৈন্যদের অভ্যর্থনা জানান, আফগান কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন এবং পরে মার্কিন দূতাবাসে একটি বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। যদিও অনেক আমেরিকান রাজনীতিবিদ আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন, তিনি 2009 সালে ওবামা প্রশাসনের কাছ থেকে সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে দমন করতে অনিচ্ছার কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। 2009 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর কারজাই সমস্যাটি মোকাবেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে "দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সরকারে কোন স্থান হবে না।"

ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে আফগানিস্তানে অঘোষিত সফরের অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ওবামা কাবুলে আসার পর 2 মে 2012-এ, আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দুই দেশের মধ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মার্কিন -আফগানিস্তান কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি , আনুষ্ঠানিকভাবে " আফগানিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী কৌশলগত অংশীদারি চুক্তি" শিরোনাম, আফগানিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে। আফগানিস্তান যুদ্ধে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলো। কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তিটি 4 জুলাই, 2012-এ কার্যকর হয়েছিল, যেমনটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, যিনি 8 জুলাই, 2012-এ আফগানিস্তান বিষয়ক টোকিও সম্মেলনে বলেছিলেন : "এখানে প্রতিনিধিত্বকারী বেশ কয়েকটি দেশের মতো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তান একটি কৌশলগত অংশীদারি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যা চার দিন আগে কার্যকর হয়েছে।"
7 জুলাই 2012-এ, স্থায়ী কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তির অংশ হিসাবে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন রাষ্ট্রপতি কারজাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য কাবুলে আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে একটি প্রধান ন্যাটো মিত্র হিসেবে মনোনীত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী পর্যায়ক্রমে 2002 সাল থেকে আফগানিস্তানে তার সৈন্যের মাত্রা বৃদ্ধি এবং হ্রাস করছে, যা 2010 সালে প্রায় 100,000-এর সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। এর পরে 2011 সালের মাঝামাঝি থেকে 2014 সালের শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সৈন্য হ্রাস করা হয়েছিল। তবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 2014 সালের পরে আরও মার্কিন সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার প্রস্তাব করেছিলেন। জানুয়ারী 2017 সালে, মার্কিন গোয়েন্দা ও রসদ সংক্রান্ত বিষয়ে তালেবান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে 300 মেরিন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

2012 সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তানকে প্রধান নন-ন্যাটো হিসাবে মনোনীত করার পরে আমেরিকান ও আফগান কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে তাদের এখন একটি চুক্তির কাজ করতে হবে যা আফগানিস্তানে অবশিষ্ট আমেরিকান বাহিনীকে আফগান সৈন্যদের প্রশিক্ষণ এবং 2014 সালের পরে বিদ্রোহীদের ট্র্যাকিং চালিয়ে যেতে দেবে। আমেরিকান কর্মকর্তাদের মতে এই ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা এখনও শুরু হয়নি। থাকতে পারে এমন সৈন্য সংখ্যার অনুমান 10,000 থেকে 25,000 বা 30,000 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সেক্রেটারি ক্লিনটন 7 জুলাই, 2012-এ পুনর্ব্যক্ত করেন যে ওয়াশিংটন আমেরিকান সৈন্যদের আফগানিস্তানে রাখার কল্পনা করেছিল, যেখানে তারা আফগান বাহিনীকে তালেবানের উপর একটি প্রান্ত দিতে প্রয়োজনীয় বিমান শক্তি এবং নজরদারি ক্ষমতা প্রদান করবে। "এই ধরনের সম্পর্ক যা আমরা মনে করি বিশেষভাবে উপকারী হবে যখন আমরা উত্তরণ করি এবং আমরা 2014-এর পরে উপস্থিতির জন্য পরিকল্পনা করি," তিনি বলেন। "এটি আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর জন্য একটি বৃহত্তর সক্ষমতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাথে একটি বিস্তৃত ধরণের সম্পর্কের দরজা খুলে দেবে ।"
2018 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী মাসগুলিতে তাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় 13,000 থেকে কমিয়ে 8,600 করতে সম্মত হয়েছিল।

ডিসেম্বর 2019-এ, আফগানিস্তানের প্রকাশিত কাগজপত্র অনুযায়ী উচ্চ-পদস্থ সামরিক এবং সরকারী কর্মকর্তারা সাধারণত আফগানিস্তানে যুদ্ধ অজেয় ছিল বলে অভিমত পোষণ করেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে এটি গোপন রেখেছিলেন। "পাঠ্য শিক্ষা" শিরোনামের প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে 2001 সাল থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন সহায়তার 40% দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, যুদ্ধবাজ, অপরাধী এবং বিদ্রোহীদের পকেটে শেষ হয়েছে।

29 ফেব্রুয়ারী, 2020-এ, খলিলজাদ (মার্কিন দূত) এবং তালেবানের বারাদার একটি শর্তসাপেক্ষ শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যা 2021 সালের মে এর আগে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য প্রত্যাহার করার পথ প্রশস্ত করে। চুক্তিতে তালিবান পক্ষ থেকে বলা হয় যে তারা কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হবে না।

চুক্তিটি ব্যাখ্যা করে যে আন্তঃ-আফগান আলোচনা পরের মাসে শুরু করতে হবে, আফগান প্রেসিডেন্ট ঘানি বলেছেন, আলোচনায় প্রবেশের আগে তালিবানদের তার নিজের সরকারের শর্ত পূরণ করা উচিত। তবে উল্লেখ্য মার্কিন-তালিবান চুক্তি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দিকে ইঙ্গিত করেনি । চুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক পরের দিনগুলিতে, তালিবানের যোদ্ধারা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর উপর কয়েক ডজন হামলা চালায় । হামলার প্রতিক্রিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেলমান্দ প্রদেশে তালেবান সেনাদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালায় ।

29 ফেব্রুয়ারী 2020-এ মার্কিন-তালেবান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো মিত্ররা আফগানিস্তানে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আগামী 14 মাসের মধ্যে আফগানিস্তানে অবস্থানরত অসামরিক সৈন্যদের সংখ্যা হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিন-তালেবান শান্তি চুক্তির সহিংসতা অব্যাহত থাকার এক সপ্তাহেরও কম সময় পরে, 6 মার্চ বিরোধী নেতা আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ কর্তৃক আয়োজিত একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদানকারী জনতার ভিড়ে দুই আইএসআইএল বন্দুকধারী 32 জন বেসামরিক লোককে হত্যা করে এবং কমপক্ষে 58 জন আহত করে। ২০২০ সালের ২০ শে মার্চ জাবুল প্রদেশে পুলিশ ও সেনা চৌকিতে তালেবানের অতর্কিত হামলায় ২৪ আফগান নিরাপত্তা বাহিনী নিহত হয়। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তালেবানের হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে যে " আফগান জাতীয় প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিক্রিয়া ছাড়া এই আক্রমণ ছেড়ে যাবে না, এবং শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ নেবে," তাদের বাহিনীর মধ্যে সহিংসতা কমাতে স্বাক্ষরকারীর প্রতিশ্রুতিকে হুমকি দেয়।

আফগান এবং তালেবান নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনার পরিকল্পনাগুলি কেবল দুই পক্ষের মধ্যে অব্যাহত সহিংসতার কারণেই নয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কারণেও জটিল হয়েছিল যা একটি সরকারী বিভক্তির কারণ হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি আশরাফ ঘানি এবং আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ "বিচ্ছিন্নভাবে অফিসের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। "৯ মার্চ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে। অধিকন্তু, কোভিড-১৯- এর আকস্মিক প্রাদুর্ভাবের সাথে , মার্কিন সেনা প্রত্যাহার প্রক্রিয়াটি পেন্টাগনের নির্দেশাবলীর দ্বারা প্রয়োজনীয় কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতির দ্বারা জটিল হয়ে পড়ে যাতে প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদের স্বল্পমেয়াদী কোয়ারেন্টাইনে রাখা প্রয়োজন।

13 এপ্রিল, 2021-এ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 11 সেপ্টেম্বর, 2021 সালের মধ্যে আফগানিস্তানে অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। প্রত্যাহার শুরু হয় ১ মে থেকে, এবং তালেবানরা একই সাথে দেশব্যাপী আক্রমণ শুরু করে ।১৫ আগস্ট কাবুলের পতন ঘটে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরের দিন, বিডেন প্রেসের কাছে স্বীকার করেন যে তার প্রশাসন তালেবানরা এত দ্রুত কাবুলে পৌঁছাবে বলে আশা করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ৩০শে আগস্ট আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার সম্পন্ন করে, যার উপর তালিবান বিজয় দাবি করে। কাবুলে মার্কিন দূতাবাস- আগস্ট ১৫ তারিখে হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থানান্তর করা হয়েছে —আফগানিস্তানে ৩১শে আগস্ট অপারেশন স্থগিত করে এবং কাতারের দোহায় স্থানান্তরিত করা হয় । 12 নভেম্বর, 2021-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষা শক্তি হিসাবে কাজ করার জন্য 31 ডিসেম্বর কাবুলে কাতারের দূতাবাসে একটি স্বার্থ বিভাগ খোলা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কূটনৈতিক মিশনগুলি 16 মার্চ, 2022-এ অপারেশন বন্ধ করার এবং সম্পত্তিগুলির হেফাজত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে হস্তান্তর করার আগে বেশ কয়েক মাস স্বাধীনভাবে কাজ করেছিল।

২০২১ সালের ১৫ আগস্ট কাবুলের পতনের পর তালেবান আফগানিস্তানের শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়।
উল্লেখ্য, ভারতের আফগান সমস্যা তীব্রতর হয়ে ঘুরে আসে ২০২১-এ। আশরফ ঘানি সরকারের পতন ঘটে, এবং এর পরপরই পাকিস্তান প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, তালিবানরা তাদের বন্ধু। ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের যে সব উন্নয়ন প্রকল্পে ভারত বিপুল অর্থ প্রয়োগ করেছে তার ভবিষ্যৎ কী হবে, কিংবা ভারতের অর্থ সাহায্যে নির্মীয়মান জারাঞ্জ-ডেলারাম হাইওয়ে সম্পূর্ণ হবে কিনা, অথবা ইরানের চাবাহার বন্দরকে 'ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর'-এর সঙ্গে যুক্ত করা যাবে কিনা, কাশ্মীরের সন্ত্রাসে তালিবানি প্রভাবই বা কতটা থাকবে, এইসবই ভারতের কাছে এখন বড়ো প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অলোক কুমার ঘোষ
প্রণব কুমার চ্যাটার্জি
Wikipedia

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.অলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০১২, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক,২০১২।

2.প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, হাওড়া: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১|

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. Critically discuss Soviet invasion in Afghanistan.
2. Write an essay on emergence of Taliban in Afghanistan.
3. Discuss how Taliban came into power for the second time in Afghanistan.

Block 6

Phases of Indo-China Relations

Unit 15, 16

Unit 15: The Mao and post-Mao periods, Chinese expansionism and India's reaction, the CPEC and OBOR projects

Unit 16: Indo-China border conflicts from 1960-recent conflicts in Doklam (2019) and Ladakh (2022)

উদ্দেশ্য

ভারত-চীন সম্পর্ক

প্রথম পর্ব (১৯৪৯-৫৯ খ্রি.)

চীন-ভারত সম্পর্কের নতুন রূপরেখা

CPEC

OBOR

ভারত চীন সংঘাত
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারত চীন সম্পর্ক

২. চীন সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ

৩. ভারত চীন সংঘাত সম্পর্কে

ভারত-চীন সম্পর্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান এশিয়া তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এই দুটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত রাষ্ট্র সুদূর অতীতকাল থেকে পারস্পরিক মিত্রভাবাপন্ন। চীনে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে (অক্টোবর, ১৯৪৯ খ্রি.) ভারত উল্লসিত হয় এবং ৭ই ডিসেম্বর ভারত চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি জানায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারত নিরলস প্রচেষ্টা চালায়।

ভারত-রুশ বা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের চাইতে ভারত-চিন সম্পর্কের শর্তগুলো ছিল ভিন্ন ধরনের। রাশিয়া বা আমেরিকার শক্তিকেন্দ্র ছিল ইউরোপ, কিন্তু চিনের ছিল এশিয়া, যেখানে ভারত নিজেও একটি নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে চাইছিল। তাছাড়া সীমান্ত নিয়ে, তিব্বত বা সিকিম নিয়ে এশিয়ার অন্যতম দুই ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র হিসাবে উত্থান হয় ভারত এবং চীনের। চিনের সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ বিরোধ ছিল, যেরকম কোনও বিরোধ রাশিয়া বা আমেরিকার সঙ্গে থাকার প্রশ্ন নেই। দ্বিতীয়ত যে সোভিয়েত রাশিয়াকে ১৯৫৪ সালের পর চিন 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে তাত্ত্বিক আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছিল, সেই রাশিয়ার দিকেই ছিল নেহরুর ভারতের ঝোঁক। তারই প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানকে সামরিক ও রাজনৈতিক খাঁটি বানাবার তালে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্বভাবতই চির-ভারত-বিরোধী পাকিস্তানকে মার্কিন কবল থেকে বার করে আনবার জন্য চিন পাকিস্তানকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিল, আর সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতের অভিমানের কারণ। কিন্তু তবুও নির্জোট নীতির কার্যকরতার স্বার্থটিকে মাথায় রেখে নেহরু চিনের দিকের দরজা খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রসংঘে চিনের অন্তর্ভুক্তি আর তাইওয়ানকে বহিষ্কারের দাবিতে দুনিয়া তোলপাড় করেছিলেন, এবং ইংরেজ-আমল থেকে তিব্বতে পাওয়া সুবিধেগুলো বিসর্জন দিয়ে সই করেছিলেন 'Sino Indian Agreement on Tibet Region of China'-তে, চিনে গিয়ে দেখা করেছিলেন মাও জে দং-এর সঙ্গে। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় নিরপেক্ষতা চিনকে কিছুটা আশ্বস্ত, কিছুটা খুশি করেছিল, তাই সম্ভব হয়েছিল ১৯৫৪ সালের ভারত-চিন চুক্তি আর ১৯৫৪ সালের ২৯ মে-র 'পঞ্চশীল ঘোষণা'। চিনের এশীয় নীতির আলোচনায় এই পঞ্চশীলের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘোষণায় যে সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, রাগ-বিরক্তি- ভালোবাসায় মেশানো চিন-ভারত সম্পর্ক অন্তত যুদ্ধের দিকে গড়াবে না কখনও।

কিন্তু সম্পর্কটা এক দশক কাটিয়ে ওঠার আগেই তিক্ততায় নিষিক্ত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল চিন-বিরোধী তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা-র ভারতে আশ্রয় প্রাপ্তি দিয়ে, ১৯৫৯ সালে। শেষ হয়েছিল ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধে। সীমান্ত বিরোধ ছিল যুদ্ধের কারণ, কিন্তু লড়াই বাধানোর জন্য দায়ী কে, তার নিষ্পত্তি করা মুশকিল, হয়তো প্রীতিকরও নয়। ১৯৫৮ সালে যখন চিন বুঝতে পেরেছিল, রাষ্ট্রসংঘে তার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ের ভারতের ভূমিকার কোনও দাম নেই, তখন থেকেই

ভারতের বন্ধুত্বকে আর সে গুরুত্ব দেয়নি, তার কাছে অনেক বেশি মূল্য পেয়েছিল সীমান্তের স্বার্থ। চিন-ভারত সীমান্তে ম্যাকমোহন রেখার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, চিন সরাসরি পূর্বভারতের শুরু পেরিয়ে অন্তিম উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ডিফু বর্ম্ম বেয়ে কুমজাও বর্জ্য, হিপঙ্গন বর্ম্ম এবং চাউখন বর্ম্ম পর্যন্ত দাবি করেছিল। ঐ সময়ে (১৯৫৩-৫৪) চিন যেসব মানচিত্র প্রকাশ করেছিল, সেগুলোতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের প্রায় ৩৬,০০০ বর্গমাইল এবং উত্তর পশ্চিমে ভারতের লাদাখের উত্তর পূর্বে প্রায় ১৫,০০০ বর্গমাইল এলাকা চিনের অঞ্চল বলে দেখানো হয়। ১৯৫৬ সালে চিনা প্রধানমন্ত্রী জৌ-এন-লাই-এর দিল্লি সফরও এই বিরোধ মেটাতে পারেনি। ১৯৫৭ সালে চিনি লাদাখর অন্তর্গত আকসাই চিনে বড়ো রাস্তা বানিয়ে নেয় আর সংশ্লিষ্ট কয়েকটি লাদাখী অঞ্চল দখল করে নেয়। ১৯৫৯ সালের ২৮ আগস্ট নেহরু লোকসভায় জানান যে, চিনা সেনা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কয়েকটি সেনাঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে এইভাবেই কেটে যায় তিনটি বছর। চিন-ভারত সরাসরি যুদ্ধ বাধে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে। যুদ্ধে ভারতই ছিল আহতের ভূমিকায়, তবে ২১ নভেম্বর একতরফাভাবেই যুদ্ধ থামিয়ে চিন তার স্বীকৃত সীমানায় ফিরে গিয়েছিল, সম্ভবত তার ঘোষিত "সমাজতান্ত্রিক সততা" বজায় রাখার তাগিদে।

প্রথম পর্ব (১৯৪৯-৫৯ খ্রি.)

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অভ্যুদয়ের পর প্রথম একদশককাল ধরে ভারত-চীন সম্পর্ক মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক ও সৌভ্রাত্রমূলক ছিল। পণ্ডিত নেহরুর মতে সাম্যবাদী চীনের অভ্যুদয় সুদূর-প্রাচ্য ও বিশ্বরাজনীতিতে ভারসাম্যে পরিবর্তনসাধন করেছে ("The whole balance of power has changed not only in the Far East but in the world because of this New China,-মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত নেহরুর পত্র, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫০ খ্রি.)। নেহরুর ধারণা হল এশিয়া ও বিশ্বরাজনীতিতে চীনের প্রভাব অগ্রাহ্য করা ইতিহাসের গতিকে অস্বীকার করা। তাঁর মতে ভারত ও চীন উভয়ের স্বার্থে ও এশিয়ার স্বার্থে পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপন প্রয়োজন। বিশ্বশান্তির পক্ষেও ভারত-চীন মিত্রতা অপরিহার্য 'We wanted to be at peace and to have friendly relations with the other countries of the world, but in the perspective of history the relations of India and China were even more important.-মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত নেহরুর পত্র, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রি. Letters to the Chief Ministers, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৪)।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পরিচালিত হয়ে নেহরু চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আন্তরিকতার উদ্যোগী হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভিকাতের ওপর চীনের প্রাধান্য স্থাপিত হলে সাময়িকভাবে ভারত-চীন সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিলেও সম্পর্কের কোন অবনতি ঘটেনি। ভারতবর্ষ কোরিয়া ও ইন্দো-চীন সংকটে মা হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। ভারত ও চীন একযোগে সামরিক জোট প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেছে। এরপর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ভারত সফরকে কেন্দ্র করে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিকাতর হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য 'পঞ্চশীল' অথব পাঁচটি সূত্র ঘোষিত হয়। চীন ও ভারত একত্রে এশিয়ার সংহতি ও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়া দেশগুলির সম্মেলনে চীন ও ভারত বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বান্দুং সম্মেলনের কার্যকলাপের ওপর একদিকে যেমন বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল, অন্যদিকে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অবতারণা হল।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫৯-৭৯ খ্রি.): ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে চীন-ভারত এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে-সমান্তরালভাবে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে সংহতি বিনষ্ট হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে চীন-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দলাইলামা ভারতে এসে আশ্রয় নিলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে ভারত ও চীনের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের সঙ্গে চীনের সীমান্ত বিরোধ শুরু হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর নেফা ও লাদাক-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত চীন-ভারত সংঘর্ষ বাঁধে। ২১শে নভেম্বর চীন একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। চীন-ভারত বিরোধ শুরু হওয়ার পর এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ঐ সংঘাতের মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলম্বো প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চীন-ভারত বিরোধ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির জল-বিভাজিকা নামে পরিচিত। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নেহরুর উদ্যোগে ভারত ও চীনের যৌথ উদ্যোগে আন্ত-এশীয় ঐক্য, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হল। চীন-ভারত বিরোধের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ নেয়। প্রসঙ্গত, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধে ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীন ভারতের বিরোধিতা করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে সচেষ্ট হয়। ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমিক সম্প্রীতি চীন-সোভিয়েত সম্পর্কে পরোক্ষভাবে অবনতি ঘটায়। অধ্যাপক ভি. পি. দত্ত মন্তব্য করেছেন "India had become a significant factor in the developing Sino-Soviet dispute. (India's Foreign Policy, পৃ. ২০-তদেব)।

সত্তরের দশকের শেষ থেকে চীন-ভারত সম্পর্ক পুনরায় স্বাভাবিক হতে শুরু করে। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি চীন সফর করেন (১৯৮৮ খ্রি.)। চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেং পরবর্তীকালে ভারত সফরে আসেন। চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি নিঃসন্দেহে এশিয়ার রাজনীতিতে সুস্থিতি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।।

চীন-ভারত সম্পর্কের নতুন রূপরেখা :

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চীন শীর্ষসম্মেলনের পর দুটি দেশ সহাবস্থানের পথ অনুসরণ করে চলেছে। ভারত-চীন সম্পর্ক এশিয়া তথা বিশ্বরাজনীতির পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কেননা, এই দুটি দেশ এশিয়ার দুই বৃহত্তম রাষ্ট্র, প্রভূত সমরশক্তির অধিকারী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশাল বাজারের উপযোগী। জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এ দুটি দেশে বসবাস করে। এশিয়ার এই দুই বৃহৎশক্তির সম্পর্কের ওপর এশিয়ার আর্থিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে চীনের রাষ্ট্রনায়ক দেও-পিয়াও পিং যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন-আগামী শতককে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের শতক বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চীন ও ভারত এর অগ্রগতির ওপর আগামী শতকের ভাগ্য নির্ভরশীল|

(If India China fail to develop, it cannot be called an Asian century. A true Asia Pacific of Asian century will not emerge unless China, India and some of their neighbouring countries are

developed.) বেজিং রিভিউ, জানুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রি.)। দেও-এর বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ কেননা ভারত হল চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিবেশী এবং দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ সীমানা বিদ্যমান। ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রক্ষা করা চীনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের পক্ষে জরুরী। এছাড়া সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিনা দিক থেকে দ্বি শাক্তিক সম্পর্ক উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হবে।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের পর দুই দেশের মধ্যে যৌথ কার্যবাহীগোষ্ঠী (Joint working group) গঠিত হয়েছে এবং পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারে দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছে। সীমান্তে সামরিক তৎপরতা হ্রাস করে সীমান্ত বাণিজ্যের পরিধি প্রসারিত হয়েছে।

নব্বুইয়ের দশকে চীন-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৮৯৫ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ ১.২-১.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁচেছে। ভারত থেকে চীনে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৮০.৯৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪১৬.৫৭ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় পঞ্চাশের দশকের শুরুতে যখন চীন-ভারত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল সেসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি, কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সম্পর্ক পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে। চীনের রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন ১৯৯৬-এর নভেম্বরে ভারতে আসেন এবং ভারত সরকারের সঙ্গে চীনের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষ সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে। নিয়ন্ত্রণরেখার মর্যাদা রক্ষার জন্য দুইপক্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া চীন পারমাণবিক প্রযুক্তি ও অস্ত্র অন্য কোন দেশ বা অঞ্চলকে সরবরাহ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে এবং একে অন্যের সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চীন-ভারত সম্পর্কে উন্নতির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী চীন সফরে যান এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকে চীন কাশ্মীর প্রশ্নে একতরফাভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিকিমের ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে সম্মতি জানায়। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে চীনের রাষ্ট্রপতি হু-জিন-তাও ভারতে আসেন এবং উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আবেদন জানান। এরপর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়া বাও-এর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী ভারতকে সহযোগী দেশরূপে অভিহিত করেন (Partner, not rivals)। "একুশ শতকে ভারত ও চীনের পারস্পরিক সম্প্রীতির দৃষ্টিকোণ" নামে একটি বিবৃতি জারি করা হল। এর থেকে প্রমানিত হয় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিতে চীন যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তার পরিষদে ভারতের সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে চীন সমর্থন জানাবে এবং অন্যদিকে ভারত অসামরিক পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসে উদ্যোগী হবে।

চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি এশিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে দ্বি- পাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি বহু-পাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তো প্রয়োজন। আনন্দের কথা ভারত-চীন যৌথ কার্যকর সংস্থা গঠন, আসিয়ান (ASEAN) আঞ্চলিক মঞ্চে চীনের অংশগ্রহণ, রুশ-চীন যৌথ উদ্যাগ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় (W.T.O) চীনের যোগদান প্রভৃতি পদক্ষেপ এশিয়ার স্থিতিশীলতার পক্ষে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এশিয়ার দেশগুলির জন্য নিরাপত্তা ও

সহযোতিার জন্য আঞ্চলিক সংস্থা গঠন, ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী যুগে এশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়ক হবে। আনন্দের কথা চীন ও ভারত উভয়েই শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। দেও-এর মতে শান্তি ও উন্নয়ন অবিভাজ্য। এই ধারণা ভারত ও চীন উভয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে এবং চীন ও ভারত উভয়ে সচেষ্ট হলে এশিয়ার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বজায় রাখা দুররূহ হবে না।

CPEC:

China-Pakistan Economic Corridor চীন–পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর হল অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলির (Infrastructure Network Project) একটি, যা বর্তমানে পুরো পাকিস্তান জুড়ে নির্মাণাধীন রয়েছে। সিপিইসি প্রকল্প হল চীন ও পাকিস্তান এর মধ্যে গড়ে ওঠা এক বিশেষ অর্থনৈতিক করিডোর। করিডোরটি চীনের প্রস্তাবিত **ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড** নীতির অন্তর্গত এবং এটি চীনের অর্থ সহায়তায় গড়ে তুলা হচ্ছে। এই করিডোরটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ২,০০০ কিলোমিটার।এটি পাকিস্তানএর গদর শহরের গদর বন্দর থেকে চীনের শিনচিয়াং প্রদেশের কাশগর পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পে গদর ও কাশগর মহাসড়ক ,রেলপথ দ্বারা যুক্ত হবে। এছাড়া এই পথে অপটিকাল ফাইবার বসানো হবে দ্রুত যোগাযোগের জন্য। তেল ও গ্যাসের পাইপ লাইন এই পথে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।এই প্রকল্পে গদর ও কাশগর এর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, লাহোর ও করাচি যুক্ত হবে। করিডোরের অংশ হিসাবে ১,১০০ কিলোমিটার করাচি থেকে লাহর পর্যন্ত মোটরওয় নির্মাণ করা হবে। রায়ালপিন্ডি থেকে কাশগর পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে ১,৩০০ কিলোমিটার (৮১০ মা) কারাকোরাম মহাসড়ক। করাচি থেকে খাইবার পাক্তুন পর্যন্ত রেল পথকে আধুনিক করা হবে। করিডোরের নির্মাণ কাজে যুক্ত রয়েছে ৭ হাজার চীনা কর্মী। এই করিডোরের পাশে প্রায় ১২টির মত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়া হবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৫০ সালে চীন সীমান্ত থেকে গদর পর্যন্ত করিডোর নির্মাণের চেষ্টা চালায়। এর পর ১৯৫৯ সালে ১,১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কারাকোরাম হাইওয়ে নির্মাণ শুরু হয়। এই হাইওয়ে চীন ও পাকিস্তানকে যুক্ত করেছে। এর পর চীন ১৯৯৮ সালে গদর বন্দর নির্মাণে আগ্রহ দেখায়। ২০০২ সালে গদর বন্দর নির্মাণ শুরু করে চীন এবং ২০০৬ সালে বন্দরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। চীন ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড নীতিতে গদর এর সঙ্গে কাশগরের সংযোগের কথা বলে।শেষে চীন ও পাকিস্তান এর সহযোগিতায় শুরু হয় **চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর** নির্মাণ। এই প্রকল্পটি চীন তার **ত্রয়দশ পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা**তে উল্লেখ করে। ২০১৫ সালে এই করিডোর গড়ার জন্য চীন ও পাকিস্তান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বর্তমানে এর নির্মাণ কার্য চলছে।

OBOR:

One Belt, One Road

২০১৩ সালে চীন সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যতম একটি পলিসি হল **One Belt, One Road ।** চীনের রাষ্ট্রপতি শি চিনফিং দ্বারা প্রস্তাবিত এ কাঠামো দেশসমূহ, বিশেষ করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং ইউরেশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের

পরিকল্পনা নিয়ে গৃহীত হয়েছিল। এই কৌশল বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহে চীনের একটি বড় ভূমিকা নেওয়ার পথ সুগম করে। একইসাথে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন ইস্পাত উৎপাদন, চীনের অগ্রাধিকার ধারণক্ষমতা সহযোগিতার প্রয়োজন তুলে ধরে।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে চীনের নেতা *শি চিনফিং* যখন মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর করেছিলেন, তখন তিনি যৌথভাবে সিল্ক রোড অর্থনৈতিক বলয় এবং একুশ শতাব্দীর উপকূলবর্তী সিল্ক রোড নির্মাণের উদ্যোগ উত্থাপিত করেছিলেন। মূলত, 'বলয়' মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে প্রকৃত সিল্ক রোড এর উপর অধিষ্ঠিত দেশসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। উদ্যোগটি অবকাঠামো নির্মাণ, সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি, এবং বাণিজ্য বাড়ানোর মাধ্যমে এই অঞ্চলটিকে একটি সংযোজক অর্থনৈতিক এলাকার মধ্যে একীকরণের জন্য আহ্বান জানায়। মূলত ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের অনুরূপ এই অঞ্চলটি ছাড়াও, অন্য একটি এলাকা যেটি এই 'বেল্ট' সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি হলো দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এই বেল্টের অংশ এমন অনেক দেশ চীন নেতৃত্বাধীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এরও সদস্য। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বেল্ট প্রস্তাব করা হয়েছে। উত্তর বেল্ট মধ্য এশিয়া, রাশিয়া এবং ইউরোপ এর মধ্য দিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় বেল্ট মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া হয়ে পারস্য উপসাগর এবং ভূমধ্যসাগরে যাবে। দক্ষিণ বেল্ট চীন থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া মধ্য দিয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরে শেষ হবে। কেন্দ্রীয় বেল্ট জটিল ধর্ম সমস্যা ও বেল্ট বরাবর বিচ্ছেদ আন্দোলনের কারণে কম উচ্চারিত হয়ে আসছে।

উপকূলবর্তী সিল্ক রোড, যা "টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি মেরিটাইম সিল্ক রোড" নামেও পরিচিত একটি পরিপূরক বিনিয়োগ যার লক্ষ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ওশেনিয়া, এবং উত্তর আফ্রিকায় বিভিন্ন জল-সংলগ্ন এলাকা – দক্ষিণ চীন সাগর, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর, এবং ব্যাপকতর ভারত মহাসাগর এলাকার মাধ্যমে সহযোগিতা পরিবেষ্টন এবং লালন করা। উপকূলবর্তী সিল্ক রোড উদ্যোগ ২০১৩ সালের অক্টোবরে ইন্দোনেশিয়ান পার্লামেন্টে বক্তৃতা দানকালে শি চিনফিং দ্বারা সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত হয়। সিল্ক রোড অর্থনৈতিক বলয় উদ্যোগের মতো, এই এলাকার বেশিরভাগ দেশ চীন নেতৃত্বাধীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক যোগদান করেছে।

ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড উন্নয়ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধান দল ২০১৪ সালের শেষদিকে কোন এক সময়ে গঠন করা হয়, এবং তার নেতৃত্বদানকারী দল ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তে প্রকাশ করা হয়। এই পরিচালনা কমিটি সরাসরি চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী রাজ্য পরিষদকে সরাসরি প্রতিবেদন দেয় এবং বিভিন্ন শক্তিশালী রাজনৈতিক সঙ্ঘ নিয়ে গঠিত যা সরকারের নিকট এই কর্মসূচির গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে।সহ-প্রধানমন্ত্রী ঝাং গাওলি কে প্রধান করে ৭ সদস্যের পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয় যার মধ্যে ওয়াং হানিং, ওয়াং ইয়াং, ইয়াং জিং, এবং ইয়াং চিয়ে ছি তাদেরকে উপনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।২০১৪ সালের মার্চ মাসে, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি খছিয়াং দেশটির আইনসভার বার্ষিক সভায় উপস্থাপিত তার সরকারের কাজের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর এবং চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর এর পাশাপাশি "ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড" উদ্যোগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

ফিচ রেটিং এর একটি প্রতিবেদনে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে অনুন্নত ইউরেশিয়া এবং আফ্রিকায় বন্দর, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের জন্য চীনের এই পরিকল্পনার পিছনে পরিকাঠামোর জন্য বাস্তব চাহিদার বদলে রয়েছে রাজনৈতিক প্রেরণা। এছাড়াও ফিচ চীনের ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে কারণ নিজ দেশেই তারা দক্ষতার সাথে সম্পদ বন্টণে সুনাম বজায় রাখতে পারেনি। এর ফলে বেশিরভাগ অর্থায়ন যেখানে চীনা ব্যাংক থেকে আসার কথা, সেখানে নতুন সম্পদ মানের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

Unit 16: Indo-China border conflicts from 1960-recent conflicts in Doklam (2019) and Ladakh (2022)

ভারত চীন সংঘাত

১৯৬২ এর পর প্রায় দু'দশক লেগেছিল চিন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন হয়, ভারতীয় প্রশাসনের মতে, সেটা ছিল রাষ্ট্রবিরোধী। অথচ চিনের সরকারি মুখপত্র 'পিপল্স ডেইলি'-তে তাকে "বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ" বলে সাধুবাদ জানানো হয়েছিল। স্বভাবতই এটা ভারতকে খুশি করেনি। তবে ভারত তার মনোভাব পাল্টাতে শুরু করে ১৯৭৬ সালে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও জে দং-এর মৃত্যুর পর। মাও-পরবর্তী চিনা নেতৃত্ব মাও নেতৃত্বাধীন ১৯৬৫-৭৫ বছরগুলিকে চিনের সবচেয়ে বিপর্যয়কর দশ বছর হিসেবে চিহ্নিত করেন, মাও-সমালোচক দেং জিয়াও পেং ক্ষমতায় ফিরে এসে চিনকে উদার ব্যবস্থার দিকে চালাতে শুরু করেন, 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা' নীতিটি চিনা নেতৃত্বের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত সময়ের চিনা নীতিগুলোকে রাজনৈতিক বিচ্যুতির ফসল বলে বর্ণনা করা হয়। এতে নিশ্চিন্ত বোধ করে ভারত, ১৯৭৭-৮০ সালের জনতা সরকার এবং ১৯৮০-৮৪ সালের ইন্দিরা সরকার চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হয়। এরই ফল ১৯৮৪-র চিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি, ১৯৮৮ সালের ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির চিন সফর, সীমান্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্য গড়া 'জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ', কাশ্মীরকে পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিনের স্বীকৃতি, ১৯৮৯ সালে চিনা উপ-প্রধানমন্ত্রীর এবং ১৯৯০ সালে চিনা বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফর এবং ১৯৯০ সালে ভারতীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলাল, ১৯৯৩ সালের প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও ও ২০০২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বেজিং সফর।

এ পর্যন্ত সীমান্ত নিয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মোট তিনটি বৈঠক হয়েছে। প্রথম ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে বেজিং-এ, দ্বিতীয় ১৯৯০ সালের আগস্টে নতুন দিল্লিতে এবং তৃতীয়টি ১৯৯১ সালের মে মাসে বেজিং-এ। সব সমস্যা এতে মিটে গেছে, তা নয়। নতুন সমস্যা তৈরিও হয়েছে। পাকিস্তানের পরমাণু বা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে চিনের প্রত্যক্ষ সাহায্য, কারাকোরাম দিয়ে চিন-পাকিস্তানের রেল যোগাযোগ, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা আর মালদ্বীপের সমুদ্রতটে চিনের নৌ-তৎপরতা- এই সবকিছু থেকেই ভারতের মনে হয়েছে, যে, সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক দিয়ে চিন 'encirclement' বা বলয় নির্মাণের নীতি অনুসরণ করছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শাস্ত্রে এটাকে একধরনের অসহযোগিতাই বলা হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে যেমন জল ভাগাভাগি নিয়ে ভারতের মন কষাকষি চলে, তেমনি চিনের সঙ্গেও তিক্ততা হওয়ার একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কেননা চিন ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতি অংশ ইয়ারলুং সাঙপো-র ওপর বড়ো বাঁধ তৈরি করেছে। ভারত-আমেরিকা অসামরিক পরমাণু চুক্তি, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের জায়গা পাওয়ার চেষ্টা বা রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের পদে ভারতের শশী থারুরকে দাঁড় করানোর ভাবনা-এর কোনওটিই চিনের পছন্দ হয়নি এবং চিন তা গোপনও করেনি। অন্যদিকে দীর্ঘদিন সীমান্ত নিয়ে চিন ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি না করলেও বিদেশনীতির কৌশলী মোচড়ের নীতি থেকে যে সে সরে আসেনি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বারবার। অনেকদিন বাদে যখন 'হিন্দি-চিনী ভাই ভাই' আওয়াজ তোলার চেষ্টা করেছে ভারত, কিংবা ২০০৭ সালকে 'ভারত-চিন মৈত্রী'র বছর

হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলেছে, ঠিক সেই সময়ে চিনা প্রেসিডেন্ট হু-জিনতাও-এর ভারত সফরের মুখে, ২০০৬ সালের নভেম্বরে, ভারতে চিনের রাষ্ট্রদূত সুন ইউক্সি অরুণাচল প্রদেশকে চিনের অংশ বলে দাবি করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অরুণাচলে চিনের কোনও অধিকার কখনও ছিল না, বরং চিনই জম্মু-কাশ্মীরের প্রায় আটত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে।

ভারত-চিন সম্পর্কের রসায়ন তাই যতটা সামরিক, তার চাইতে অনেক বেশি অর্থনৈতিক আর ভূ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সফ্টওয়্যার বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়া, তেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন উৎস দখল করা-এই সব নানা ব্যাপারে ভারত ও চিনের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপরেও এর প্রভাব পড়েছে। ভারত মহাসাগরে হাইনান দ্বীপের কাছে জলের নীচে পরমাণু-অস্ত্রসম্পন্ন সাবমেরিন ঘাঁটি আর কুইংঘাই প্রদেশের দু'হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে পঞ্চাশটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বসিয়েছে চিন। অন্যদিকে ভারত মলাক্কা প্রণালীতে নৌ-নজরদারি বাড়িয়েছে, লাদাখে তৈরি করেছে বায়ুসেনার ঘাঁটি।

তবে, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কে এইসব টানা-পড়েন এবং 'মাল্ল-ফ্লেক্সিং ট্যাকটিক্স' বা 'ব্রিঙ্কম্যানশিপ পলিসি' অস্বাভাবিক নয়, চিন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। বরং ২০০১-২০১০ দশকের শেষে কয়েকটি ঘটনায় মনে হয়েছিল যেন, ১৯৬২-এর তিক্ততা অনেকটাই সরে গেছে। চিন ও ভারত মুম্বাই ও সাংহাইয়ে দূতাবাস খুলতে রাজি হয়েছিল, ভারত তিব্বত সম্পর্কে চিন-বিরোধিতায় আর সরব হয়নি, জিন্ হুই রেন (Jin Hui Ren) সম্পাদিত চিনা বই Social History of Tibet-এ ভুলবশত সিকিমকে ভারতের মধ্যে না দেখিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো সত্ত্বেও সরকারি ঘোষণায় চিন ভারতে সিকিমের অন্তর্ভুক্তিকে মেনে নিয়েছিল, একমত হয়েছিল সিকিম-তিব্বত সীমান্তে নাথু-লা গিরিপথে বাণিজ্য চালু করতে ও শুল্ক চৌকি বসাতে। চিন-ভারত বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধিও ঘটেছিল এই সময়ে। ২০১০ সাল পর্যন্ত ভারতের মোট আমদানির ৮ থেকে ১২ শতাংশ এসেছিল চিন থেকে। রপ্তানির ৭ থেকে ১০ শতাংশ গিয়েছিল চিনে।

কিন্তু পরের দশকেই চিন-ভারত সম্পর্ক আবার পুরনো তিক্ততায় ফিরে যায়। তার প্রকাশ হয় বেশ কয়েকটি ঘটনায়। ২০১০-এ চিন সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র নদীতে ৫১০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুত উৎপাদনের জন্য জাংমু ড্যাম নির্মাণ করে। পরিকল্পনা করা হয় ডাগু, জিয়াচা, জেগু ও আরও তিনটি জলাধার নির্মাণের। ২০১৫-তে শুরু হয় জ্যাম জলবিদ্যুত প্রকল্পের কাজ। ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহে এর ক্ষতিকারক প্রভাব থাকার সম্ভাবনা আছে বলে চিনের এই প্রকল্পগুলো ভারতের অসন্তোষের কারণ হয়। একইভাবে চিনের 'one belt one road (ওবর)' প্রকল্পের অন্তর্গত চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (CPEC) বিরোধিতা করেছে ভারত। এই করিডর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের ওপর দিয়ে যাবে, এবং সেটা পাকিস্তান বে-আইনীভাবে দখল করে রেখেছে, এটাই যুক্তি ভারতের। আবার লে-লাদাখ নিয়ন্ত্রণ রেখার সমান্তরালে ভারত দারবুক থেকে দৌলত বেগ ওল্ডি পর্যন্ত লম্বা যে সড়কপথ তৈরি করেছে, তা পছন্দ নয় চিনের, কেননা ঐ পথ ভারতীয় সেনাকে দ্রুত চিনের উইঘুর অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশের কাছে পৌঁছে দেবে।

তিক্ততার তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যে। ২০১৭ সালে ভারত-চিন-ভুটান সীমান্তের ডোকলামে চিনা অনুপ্রবেশের ফলে যে কূটনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বড়ো সঙ্কট দেখা দেয় ২০২০-তে লাদাখে, গালওয়ান উপত্যাকায়, চিনা আগ্রাসনের ফলে। ২০১৯-এ লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই চিন ভাবতে শুরু করে যে, আকসাই চিন দখলের পরিকল্পনা করছে নয়াদিল্লি। এর প্রতিক্রিয়াতেই শেরডং-

নেরলং নাম্লান এলাকায় ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে চিনা সেনা, উদ্দেশ্য শিনজিয়াং সড়কপথ থেকে ভারতকে দূরে রাখা। ভারতের চাপে পড়ে চিন অবশ্য পিছু হটে, সমঝোতায় রাজি হয়, কিন্তু তিক্ততার অবসান হয়নি মোটেও।

এই অস্থিরতার মধ্যেও রূপোলি রেখা একটাই। তা হল ২০১৯-এর অক্টোবরে তামিলনাড়ুর মমল্লপুরমে অনুষ্ঠিত ভারত-চিন বৈঠক, যার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিন প্রেসিডেন্ট শি জিনফিং ভারত-চিন সীমান্ত আলোচনা দ্রুত শুরু করার প্রশ্নে সহমত হয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অলোক কুমার ঘোষ
প্রণব কুমার চ্যাটার্জি
Wikipedia

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.অলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০১২, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক,২০১২।
2.প্রণব কুমার চ্যাটার্জি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, হাওড়া: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১|

3.Kanti Bajpai, Selina Ho, Manjari Chatterjee Miller, Routledge Handbook of China–India Relations, Routledge, 2020

4.Dr. Dhrubajyoti Bhattacharjee, China Pakistan Economic Corridor (CPEC), Indian Council of World Affairs
https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=5103&lid=835

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. How was the India-China relation before 1962?
2. Discuss India-China conflict over border issues and expansionism.